মাসিক

আলোকধারা

রেজিঃ নং - ২৭২
১৭শ বর্ষ
সপ্তম সংখ্যা
জুলাই ২০১২ ঈসাব্দী

তাসাউফ বিষয়ে বহুমুখী গবেষণা ও বিশ্লেষণমূলক জার্নাল

কাযাখস্তানে হযরত খাজা আহমদ ঈসাভী (রঃ) এর মাজার শরীফ

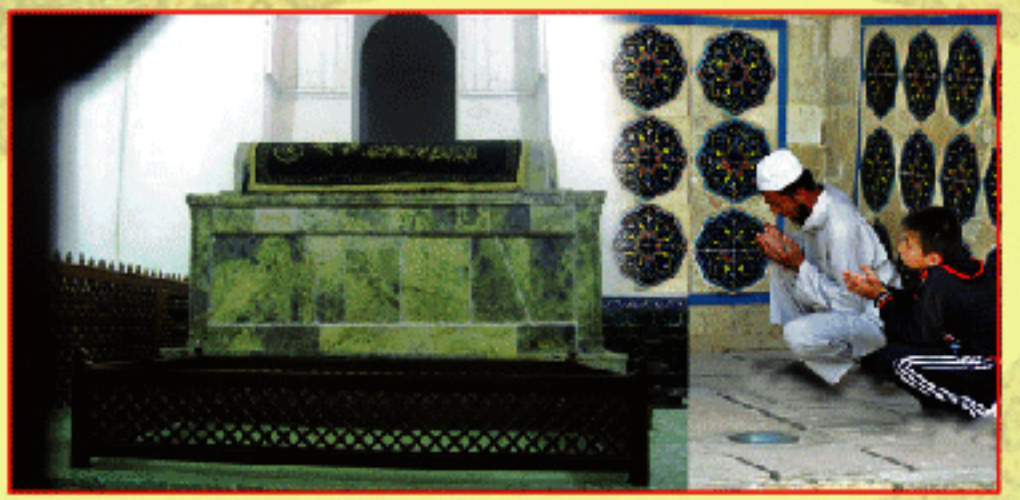

হযরত খাজা আহমদ ঈসাভীর (র) মাজার শরীফ জিয়ারতের একটি দৃশ্য

হযরত শেখ সাদী (র) এর রওজা শরীফের ভিতরের ও বাইরের দৃশ্য

ইরাকের বাগদাদ নগরীতে সুপ্রসিদ্ধ করবস্থান 'মাক্বারাতুশ্ শাইখ মারূফ কারখী' এর মধ্যে ইমাম সারি সাক্বাতির মাজার শরিফ।

মাসিক
আলোকধারা
THE
ALOKDHARA
A MONTHLY JOURNAL OF
TASAWWUF STUDIES

রেজিঃ নং ২৭২, ১৭শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা
জুলাই ২০১২ ঈসায়ী
শাবান-রমজান ১৪৩৩ হিজরী
আষাঢ়-শ্রাবন ১৪১৮ বাংলা

প্রকাশক
সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান

সম্পাদক
মোঃ মাহবুব উল আলম

যোগাযোগঃ
লেখা সংক্রান্তঃ ০১৮১৮ ৭৪৯০৭৬
০১৭১৬ ৩৮৫০৫২
মুদ্রণ ও প্রচার সংক্রান্তঃ ০১৮১৯ ৩৮০৮৫০
০১৭১১ ৩৩৫৬৯১

মূল্য : ১৫ টাকা
(US $=2)

সম্পাদকীয় যোগাযোগঃ
দি আলোকধারা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
৫, সিডিএ, সি/এ (তেতলা) মোমিন রোড,
চট্টগ্রাম। ফোন : ৬১৮৮৫৫

শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক
মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট এর একটি প্রকাশনা

website : www.sufimaizbhandari. org
e-mail address :
alokdhara@sufimaizbhandari.org
sufialokdhara@gmail.com

সূচী

■ *সম্পাদকীয় :* মুসলিম উম্মাহর আদর্শিক ঐক্যের তাগিদ দেয় মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ ----------২
■ হযরত খাজা আহমদ ঈসাজী (রঃ)
–মোঃ মাহবুব উল আলম ---------- ৩
■ পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বংসের প্রধান কারণ এ সভ্যতার ব্যবহারিক জীবন যাত্রার মধ্যেই নিহিত
– এ. এস. এম. এ. মোমিন ---------- ৪
■ জলোয়া-এ নুরে মোহাম্মদী বা তফ্‌হিরে ছুরা এনশেরাহ্
–হযরত মৌলানা শাহ্ সূফি সৈয়দ আবদুচ্ছালাম ঈসাপুরী ---- ৭
■ রোজার রহস্য
–মূলঃ ইবনুল আরবী
– অনুবাদ : সালেহ জঙ্গী ---------- ১১
■ কুরআন হাদীসের আলোকে লাইলাতুল বারাআত
– মহিউদ্দিন মোহাম্মদ জোবায়ের ----------১৫
■ সূফী সাধক শেখ সাদী (রাহ্)
– অধ্যাপক মুহাম্মদ গোফরান ---------- ১৭
■ প্রাচীন কাল থেকে বিরচিত তাসাউফ বিষয়ক কতিপয় গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
– আলহাজ্ব মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী ---------- ২০
■ শরিয়ত ও মাইজভাণ্ডারী তরিকা
– সৈয়দ মুহাম্মদ ফখরুল আবেদীন রায়হান ---------- ২২
■ আত্মার স্বরূপ : ইসলামী চিন্তাধারা ও কার্যক্রমের পুনর্মূল্যায়ন
– মূল : এম. ফেতুল্লাহ গুলেন
– অনুবাদ : মুহাম্মদ ওহীদুল আলম---------- ২৮
■ মাতৃকের দিদার লাভের পথ
–আবু মোহাম্মদ জাফরুল হক ---------- ৩১
■ ইমাম আবুল হাসান সারি বিন মুগাল্লিস আস্ সাক্বাতি আল বাগদাদী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু
– মুহাম্মদ রবিউল আলম---------- ৩৩
■ সিয়াম বা রোজার হাকিকত
– শেখ আবুল বাসার ---------- ৩৭
■ কবিয়াল রমেশ শীল
– মোঃ গোলাম রসুল ---------- ৪১
■ নবীদের ইতিহাস
– অনুবাদঃ মুহাম্মদ ওহীদুল আলম ---------- ৪৩
■ সংগঠন সংবাদ ---------- ৪৫

সম্পাদকীয়...

মুসলিম উম্মাহর আদর্শিক ঐক্যের তাগিদ দেয় মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ

গত ২ জুন শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্টের উদ্যোগে আয়োজিত 'ইসলাম ধর্মে মতবিরোধের কারণ ও উত্তরণের সম্ভাব্য উপায়' শীর্ষক এক সংলাপে পবিত্র ইসলাম ধর্মের মৌলিক চিন্তা ও লক্ষ্যকে অক্ষুণ্ন রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সংলাপে অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অভিমত প্রকাশ করেন যে, মানব জাতির চলার পথে সঠিক দিশা প্রদর্শনের জন্য ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীন হওয়া সত্ত্বেও চিন্তার ক্ষেত্রে বৈপরিত্য ও অসামঞ্জস্যের কারণে কিছু মতবিরোধ বিদ্যমান রয়েছে। আচারগত কিছু ছোটখাটো বিষয়ে কিছু অমিল হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু মৌলিক চিন্তাধারা ও আক্বিদার ক্ষেত্রে কোন প্রকার বিভ্রান্তি কিম্বা অস্পষ্টতা থাকা উচিৎ নয়। এসব বিষয়ে খোলা মনে আলোচনাপূর্বক মতৈক্যে উপনীত হওয়া জরুরী, যাতে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থে সৃষ্ট অমূলক বৈরিতা ও মতবিরোধের পথ থেকে সরে এসে দ্বন্দ্বমুখর পৃথিবীতে শান্তির আবহ রচনা করা যায়। নির্লোভ ও নির্মোহ থাকার গুণাবলী অর্জন করে পরমত সহিষ্ণুতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায়ের পরিবেশ তৈরী করে, দ্বান্দ্বিক অবস্থানের স্থলে নীতিগত সমঝোতা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা না গেলে শান্তিপূর্ণ বিশ্ব বিনির্মাণ সম্ভব না-ও হতে পারে। ইসলামের ভাবাদর্শের ব্যাখ্যা ও ভাষ্যের ব্যাপারে যুক্তি ও বাস্তবতা বিবর্জিত লক্ষ্যহীন, লাগামহীন কথা-বার্তা বলার অবকাশ নেই। নবী-রসূল-ওলী-বুজুর্গদের প্রতি অবাঞ্ছিত অসম্মানসূচক ও কটূক্তির কারণে বহু অনাকাঙ্ক্ষিত মত-পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। অথচ পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও মানবিক গুণাবলীর ইতিবাচক মূল্যায়ন প্রত্যেক সংস্কৃতিবান, সচেতন ও গতিশীল মানব সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর অন্যতম। অতীতে মুসলিম সমাজ এ ধরণের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্র থেকে শুরু করে মানব জীবনের সর্ব পর্যায়ে সৃজনশীল প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বর্তমান বিশ্বের বাস্তবতার আলোকে অতীতের মতোই মুসলিম সমাজকে নির্ভুল আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে নিজেদের করণীয় স্থির করে কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে এগিয়ে যেতে হবে।

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্টের উদ্যোগে আয়োজিত এ সংলাপ সময়োপযোগী। এই সংলাপের বক্তব্যসমূহে মূলতঃ মাইজভাণ্ডারী আদর্শ ও নীতিমালা এবং প্রত্যাশা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। প্রচুর সম্পদ ও সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও মুসলিম জাহান আজ বহু ক্ষেত্রে পশ্চাদপদ ও নিগৃহীত। মুসলিম সমাজের হাতে রয়েছে সকল প্রকার অন্ধকার দূর করার মতো আলো দিতে সক্ষম চেরাগ। প্রয়োজন ঐ চেরাগে আলো জ্বালানোর। আমাদের ধারণা, হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী শাহ্সূফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) তাঁর চিন্তা ও কর্মের মাধ্যমে যে কর্মনীতির রূপরেখা প্রণয়ন করে গেছেন, তার আলোকে আমরা আমাদের বর্তমান সময়ের করণীয় স্থির করতে পারি। অছিয়ে গাউসুল আযম শাহ্সূফি হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এসব নীতিমালার একটা তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক চিত্র তাঁর 'বেলায়তে মোতলাকা' সমেত বিভিন্ন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। আমাদের কাজ তার সূত্র ধরে আরো এগিয়ে যাওয়া। মুসলিম সমাজ তথা বিশ্ব সমাজের শান্তি ও সমৃদ্ধিপূর্ণ ভবিষ্যৎ রচনায় আগ্রহী সাধক ও সৈনিকরা এখান থেকে শক্তি ও পাথেয় সংগ্রহে ব্রতী হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হোক, মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে, এটাই আমাদের মুনাজাত।

এ মাসে মহান শবে-বরাত এবং মাহে রমজানের শুভাগমন ঘটবে। শবে বরাতের স্নিগ্ধ আলোকিত চেতনা আমাদেরকে শুভ ও কল্যাণের পথে উদ্বুদ্ধ করবে। মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ এই বোধ ও বোধিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে দেখেন। আমাদের প্রত্যাশা, পবিত্র শবে বরাতে প্রত্যেকে নিজেদের ভেতরকার শুভ ও কল্যাণবোধকে জাগ্রত ও শাণিত করতে সচেষ্ট হবেন। মাহে রমজান আমাদের জন্য আত্মশুদ্ধির এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয়। রহমত, মাগফেরাত ও নাজাতের তিনটি প্রত্যাশিত বহুল কাঙ্ক্ষিত পর্যায় পরিক্রমার মাধ্যমে আত্ম উন্নতির সুযোগ এনে দেয় মাহে রমজান। মাইজভাণ্ডার শরীফ ইসলামী আদর্শের অন্যতম প্রধান এই স্তম্ভের মধ্যে বিধৃত যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান নিখুঁতভাবে পালনের তাগিদ দেয়। আসুন! আমরা মাহে রমজানের সর্বপ্রকার সওগাত জীবনের খাঞ্চা ভরে সংগ্রহের সাধনায় ব্রতী হই। আমীন!

হযরত খাজা আহমদ ঈসাভী (রঃ)

● মোঃ মাহবুব উল আলম ●

সূফি ত্বরিকার জগতে এক বিখ্যাত নাম হযরত খাজা আহমদ ঈসাভী প্রকাশ আতা ঈসাভী (রঃ)। তিনি ঈসাভিয়া ত্বরিকার স্থপতি। জন্ম তাঁর মধ্য এশিয়ায়। সময়ের দিক থেকে তিনি হযরত মওলানা জালাল উদ্দীন রুমীর (রঃ) পূর্বসূরী। হযরত রুমীর (রঃ) জন্ম ১২০৭ ঈসায়ী সনে ও ওফাত ১২৭৩ ঈসায়ী সনে। আর খাজা আহমদ ঈসাভীর (রঃ) জন্ম ১০৯৩ ঈসায়ী সনে এবং ওফাত ১১৬৬ ঈসায়ী সনে। তাঁর জন্ম স্থান সেরাম; আর ইন্তেকাল করেন হযরত-এ-তুর্কীস্তানে। উভয় শহর এখনকার কাযাখস্তানে অবস্থিত।

খাজা ঈসাভীর পিতার নাম শায়খ ইব্রাহিম (রঃ)। মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। প্রখ্যাত সূফি সাধক হযরত আর-সালান বাবা (রঃ) তাঁকে প্রতিপালন করেন এবং তাঁকে পবিত্র কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন করে তোলেন। হযরত খাজা ঈসাভী (রঃ) এমনিতে পৈতৃক সূত্রে আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁর পিতা শায়খ ইব্রাহিম (রঃ) বিবিধ কারামতের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁকে নিয়ে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত রয়েছে। হযরত আর-সালান বাবার (রঃ) তত্ত্বাবধানে তাঁর দ্রুত উন্নততর আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটতে থাকে। তাঁর আধ্যাত্মিক বিকাশে তাঁর বড় বোনের তালিমের প্রভাব সুবিদিত। তিনি তাঁর বড় বোনের পরামর্শ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতেন এবং তদনুযায়ী আমল করতেন।

হযরত খাজা আহমদ ঈসাভী (রঃ) কেবল মহান একজন সূফি সাধকই নন, একজন তুর্কীভাষী কবিও ছিলেন। তুর্কীভাষীদের ভুবনে সূফি তরিকার বিকাশে তাঁর প্রভাব অপরিসীম। সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রকাশ পেয়েছে যে, তিনিই একমাত্র জ্ঞাত প্রাচীন তুর্কী কবি, যিনি তুর্কী আঞ্চলিক ভাষায় কবিতা রচনা করেছিলেন। প্রথম তুর্কী সূফি ত্বরিকা ঈসাভিয়া ত্বরিকার প্রতিষ্ঠাতা তিনি। তুর্কীভাষী অঞ্চলে এই ত্বরিকা দ্রুত প্রসার, পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

॥ ২ ॥

হযরত আহমদ ঈসাভী (রঃ) শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে বুখারা গমন করেন এবং বিখ্যাত আলেম হযরত ইউসুফ হামদানীর (রঃ) কাছে শিক্ষা লাভ করেন। মধ্য এশিয়ায় ইসলাম বিস্তারে তাঁর ভূমিকা ঐতিহাসিক। এই অঞ্চলে ছিল তাঁর অনেক কৃতি-মেধাবী ছাত্রের বিচরণ।

তাঁর রচিত কবিতাসমূহ মধ্য এশীয় তুর্কী সাহিত্যে ধর্মীয় লোক-কবিতা ও লোকগীতির নতুন ধারা সৃষ্টি করে। তাঁর কাব্য প্রভাবে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে অনেক আধ্যাত্মিক বা মারিফাতি কবির উদ্ভব ঘটে। তাঁর গভীর সাধনা ও প্রজ্ঞাবলে কাযাখ অঞ্চলের 'ঈসায়ী' শহর বিদ্যা ও জ্ঞানের বড় কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠে।

সৃজনশীল বিরাট কর্মজীবন শেষে তিনি ৬৩ বছর বয়সে মারিফাতের ধ্যানের সাগরে ডুব দেন এবং মহান স্রষ্টা ও সৃষ্টি রহস্য সন্ধানে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি নিজে একটি কবর খনন করে তাতে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। তুর্কী স্কলার হাসান বসরী ক্যান্টায়ে লিখেছেন, "সেলজুক বংশীয় একজন সুলতান মহান সূফি কবি মওলানা রুমীকে (রঃ) কুনিয়ায় এনেছিলেন; আর এই সেলজুকদের শাসন কালেই জন্ম ও বিকাশ ঘটেছিল তাঁর পূর্ববর্তী আরেক বিখ্যাত সূফি সাধক ও কবি হযরত আহমদ ঈসাভীর (রঃ)। এ দু' মহান শিক্ষকের প্রবল প্রভাব মানবসমাজে এখনো সমভাবে বিদ্যমান। আর্নেস্ট স্কট নামে একজন গবেষক হযরত ঈসাভীকে (রঃ) খাজেগান সূফিদের দলভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন।

তাঁর প্রবর্তিত ঈসাভী তরিকা পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে অনেক দেশে অত্যন্ত প্রভাবশালী সূফি তরিকা হিসাবে অধিষ্ঠিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে বুখারার সুলতানের দরবারে ঈসাভী সৈয়দ আতা শেখরা অত্যন্ত মর্যাদাজনক পদে বরিত হন। এই ত্বরিকার সূফিদের মধ্যে অধিকাংশই সর্বোচ্চ 'হাল' 'জজবিয়ত' সম্পন্ন ওলী আল্লাহ্। দিগ্বিজয়ী তৈমুর লং আজকের তুর্কীস্তানে এই মহান সূফি সাধকের মাজার শরীফ নির্মাণ করেন।

প্রথম কাযাখ-তুর্কী বিশ্ববিদ্যালয়কে তাঁর সম্মানে "আহমদ ঈসাভী ইউনিভার্সিটি" রূপে নামকরণ করা হয়। এছাড়া তাঁর নামে প্রতিষ্ঠা হয়েছে একটা লাইসিয়াম বা উচ্চ বিদ্যালয়। ঈসাভী সূফিদের একটা ধারা এখনো কাশ্গীরে দৃশ্যমান। তাঁরা হযরত আমীর-এ-কবির মীর সৈয়দ আলী হামদানীর (রঃ) সাথে রেশম পথ ধরে তুর্কীস্থান থেকে কাশ্গীরে আসেন। কাশ্গীরের ঈসাভী পরিবারের জ্যেষ্ঠ সদস্য পীরজাদা মোহাম্মদ শফি ঈসাভী রচিত "সিলসিলায়ে ঈসাভী" শীর্ষক উর্দু পুস্তকে এই তরিকার ঐতিহাসিক পটভূমি বিবৃত হয়েছে।

– সূত্র : ইন্টারনেট

পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বংসের প্রধান কারণ এ সভ্যতার ব্যবহারিক জীবন যাত্রার মধ্যেই নিহিত

● এ এন এম এ মোমিন ●

ভূমিকা: অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে পাশ্চাত্যে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। তার নাম দেওয়া হয় আলোকিত যুগ অথবা যুক্তিবাদের যুগ, ইংরেজীতে যা Age of Enlightenment হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। পরবর্তীতে এক শতকের তিন ভাগ সময় (৭৫ বৎসর) অতিক্রান্ত হওয়ার পর শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে মানব সমাজ এমন এক অন্ধকার যুগে প্রবেশ করে যার ফলে মানুষের জীবন যাত্রা ক্রমাগতভাবে গভীর থেকে গভীরতর সংকটে পতিত হচ্ছে। পুঁজিবাদের স্বর্ণযুগ (A golden Age of Capitalism) শুধুমাত্র খরচের খাতের সুষম মিশ্রণ, ভর্তুকি, আইন কানুন বিধিবিধান পুনঃপ্রণয়ন ও আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে পুনরায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছেনা। কারণ শিল্পায়নের অর্থনৈতিক সুবিধাদি প্রধানত বেশী বেশী উৎপাদন, লাভ বা মুনাফা ও ভারসাম্যপূর্ণ বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এই সুবিধাদি বজায় রাখা অসম্ভব। অন্যান্য সুবিধা সংরক্ষণ করতে গেলে তা আর্থিকভাবে লাভজনক হয়না। বরং শিল্পায়নের ক্ষেত্রে হেগেলীয় দর্শনের Synthesis বা সমন্বয়ই কার্যকর হয়ে থাকে আর তা হলো শিল্পায়নের মধ্যেই তার ধ্বংসের বীজ নিহিত রয়েছে। তাই একথা এখন বিনা দ্বিধায় বলার সময় এসেছে যে বিরাজমান পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বংসের বীজ এর জীবনযাত্রার মধ্যে রয়েছে।

মানবীয় সমস্যা: মানবীয় জীবনের বড় বড় যে সব সমস্যা রয়েছে তার অধিকাংশ মানুষ সমাধান করতে সক্ষম নয়। কারণ এ গুলি মানুষ তার অসংযত কর্মকান্ডের মাধ্যমে নিজেই সৃষ্টি করে। যদিও সাধারণভাবে মানুষকে মানব নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত বিষয়াদি যেমন সাইক্লোন, ভূমিকম্প, অগ্নি, শীত, বন্যা, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়। কিন্তু মানব সৃষ্ট সমস্যাদি এসব প্রাকৃতিক সমস্যার তুলনায় অল্পই উল্লেখযোগ্য হওয়ার মত বিবেচিত। মানুষ যদি সচেতনভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে কাজ করে তাহলে এ সকল মানব সৃষ্ট ভয়াবহ সমস্যা বহুলাংশে পরিহার করা সম্ভব হতো।

সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ন ও কার্যকরী পন্থায় সমস্যাদি পর্যলোচনা করার সুফল শত শত বছর ধরেই মানুষ জেনে আসছে। যেমন Rene Descartes ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে Rules for the Direction of the Mind পুস্তক ও ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে Discourse on Method পুস্তক প্রকাশ করেন। Jhon Stuart Mill ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে System of Logic প্রকাশ করেন। দার্শনিক ও গাণিতিক পদ্ধতিতে সমস্যাদি বিশ্লেষণ করার পদ্ধতি হিসাবে Reductio absurdum (যুক্তি উপস্থাপনের কৌশল যার মাধ্যমে প্রস্তাবিত বিষয়টি যৌক্তিক প্রক্রিয়ায় অসম্ভব প্রমাণিত করা। অর্থাৎ উপস্থাপিত বিষয়টি ভুল বা বিভ্রান্তিকর প্রমাণ করা।) ঐতিহাসিকভাবে একটি কার্যকর পদ্ধতি হিসাবে প্রশংসিত হয়ে আসছে যা Counties example হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এসব পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক গবেষণার মূল কারণ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ফলপ্রসূ হিসাবে বিবেচিত। অথচ দুঃখজনক হলেও বাস্তব সত্য এটাই যে, অত্যন্ত সুশিক্ষিত একজন আমেরিকানও এ সব পদ্ধতি তাদের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন না।

Jhon B. Gudis তাঁর New Republic গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, বর্তমান (অর্থনৈতিক) অধগতির প্রধান কারণ হলো ব্যক্তিগত পর্যায়ে বস্তু/ সেবার উৎপাদন বৃদ্ধি এবং এ ব্যাপারটি মোকাবিলার জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ হিসাবে ব্যয় সংকোচন, করহ্রাস, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা ১৯৯০ সালের শেষের দিক পর্যন্ত কিছুটা ফলপ্রসূ হলেও বর্তমানে এ সকল উপায় ও পন্থা অর্থনৈতিক বৃদ্ধির চাকা শুখ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোন সুফল বয়ে আনবেনা। কারণ বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যাপক উৎপাদন বৃদ্ধির সফলতা অর্জন। অর্থাৎ বিশ্ব উৎপাদন ক্ষমতার ব্যাপক সফলতার অর্থ হলো বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিল্প কারখানাগুলোর অধিক হারে ইস্পাত জুতা, সেলফোন, কম্পিউটার, চিপস, গাড়ী ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী তৈরী করার সফলতা রয়েছে অথচ বিশ্বের ক্রেতা সমাজের এই ব্যাপক বস্তু সামগ্রী ও সেবা সমূহ ক্রয় করার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ ও ইচ্ছার ঘাটতি রয়েছে। উল্লেখ্য যে এটি নিরূপন করা একটি দুরুহ ব্যাপার। ব্যাপক উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সবসময় জড়িত রয়েছে মুদ্রাস্ফীতি। আর এটি এমনই নিয়মিতভাবে সংঘটিত হয়ে আসছে যে অর্থনীতিবিদগণ এটিকে অর্থনীতি তত্ত্বের একটি প্রায়োগিক পরিভাষা হিসাবে ব্যবহার করে আসছে 'Booms and busts. Business cycle' তাই সংগত কারণেই প্রশ্ন দাঁড়ায় কী কারণে এই ব্যাপক উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটে। অথবা ব্যাপক উৎপাদন বৃদ্ধির মূল চালিকা শক্তি কী? আর এর উত্তর হলো শিল্পায়ন।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়। যা ইংল্যান্ডকে একটি কায়িক পরিশ্রম ও আধা পশুশ্রম নির্ভর অর্থনীতির পরিবর্তে একটি যান্ত্রিকতা সর্বস্ব অর্থনীতি উপহার

দেয়। কিন্তু অর্থনৈতিক এই মৌলিক পরিবর্তন শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিলনা। এটি ইংল্যান্ডের সম্পূর্ণ সংস্কৃতিতে একটি ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসে যা জীবনের সকল ক্ষেত্রে অবশ্যই কল্যাণ বয়ে আনেনি। আর জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও অনুরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়।

অনেক অর্থনীতিবিদ জনপ্রতি GDP বৃদ্ধির হারকে এই বিপ্লবের সুবিধা বা সুফল হিসাবে বর্ণনা করে থাকেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে GDP বৃদ্ধির হার মানুষের জীবন যাত্রার উন্নয়নের কোন উল্লেখযোগ্য মাপকাঠি নয়। এটি শুধুমাত্র দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের যোগফলের সমষ্টিকে বোঝায় যা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ফলাফল ও সঠিক মানব জীবন মানের অগ্রগতির বিষয়টি বিবেচনায় আনেনা বা এটি গুরুত্বহীন বিবেচনা করে।

শিল্প বিপ্লবকে বড় বড় নগর উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কারণ গ্রাম থেকে ব্যাপক সংখ্যক লোক নগরে চাকুরীর সন্ধানে গমন করে। এসব জনগোষ্টি বস্তি এলাকায় বসবাস করতে থাকে যেখানে তারা কলেরা, টাইফয়েড, যক্ষা, গুটিবসন্ত প্রভৃতি পানিবাহিত বিভিন্ন রোগ ভোগের শিকার হয়। শ্রমিকদের শ্বাসজনিত অসুখ একটি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। শিল্প কারখানায় দুর্ঘটনা নিয়মিত বিষয়ে পরিণত হয়।

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে তুলার মিলগুলিতে দুই তৃতীয়াংশ শ্রমিকই ছিল শিশু। এরাই আবার কয়লার শ্রমিক হিসাবে কর্মরত হতো। এতদ সংক্রান্ত গবেষক Henry Phelps Brown ও Sheila V. Hopkins দাবী করেন যে, এদের অধিকাংশই অপুষ্টিজনিত রোগে ভোগত ও তাদের জীবন যাত্রার মান ছিল অতি নিম্ন স্তরের। যদিও প্রাক শিল্পায়ন যুগে ইংল্যান্ডের জীবন ধারা খুব সহজ বা আরামদায়ক ছিলনা। তবে অনেকের ক্ষেত্রেই তা কয়লার খনি ও মিল ফ্যাকটরীর শ্রমিকের জীবন যাত্রার মান থেকেও অনেক আরামদায়ক ও স্বাস্থ্যপ্রদ ছিল।

শিল্প বিপ্লবের অন্যান্য কুফল ছিল আরো ভয়াবহ। নিপুন শৈল্পিক কাজে নিয়োজিত শ্রমিক তাদের চাকুরী হারালো। শিল্প বিপ্লব সমস্ত শ্রমিককে মিল, কারখানা ও খনিতে জড়ো করে। কিন্তু এসব শ্রমিক কখনো শিল্প কর্মে নিয়োজিত শ্রমিকদের মত কাজের সন্তুষ্টি বা তৃপ্তি পেতোনা। হস্ত শিল্পে একজন কর্মজীবী যে মানসিক শান্তি, গর্ব অনুভব করতেন একজন ফ্যাক্টরী শ্রমিক তার কাজের জন্য এ ধরনের কোন অহংকারবোধ করতো না।

তাছাড়া কারুশিল্প, সূক্ষ শিল্প বিষয়ক কাজে যে প্রসিদ্ধি ও সুনাম জড়িত ছিল, মিল বা ফ্যাক্টরীর কাজ কখনও সেই পর্যায়ে পৌছাতে পারেনি।

শিল্প বিপ্লব মানুষের জীবন মানকে ও মর্যাদাকে কয়লার পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। মানুষ মেশিনের প্রয়োজনীয় জ্বালানী তথা উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। অর্থাৎ মানুষকে কাঁচামালের মত ব্যবহার করা হতো তার জীবন যৌবন শুষে নিয়ে তাকে ছেঁড়া কাঁথার মতই দূরে ছুঁড়ে ফেলতো। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য মেধা, প্রতিভা, ধীশক্তি, উদ্ভাবনীশক্তি যা মানবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তথা পশুর চেয়ে তার শ্রেষ্ঠত্ব এসব গুণাবলীর মাধ্যমেই প্রকাশিত ও বিকাশিত যা এমনভাবেই রুদ্ধ করা হতো যে তা প্রায় নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে চলে যায়। শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে মানব জাতিকে মানবত্বের শ্রেষ্ঠত্ব থেকে শুষে টেনে বের করে বস্তু হিসাবে বিবেচনা করতে শিখায়, অর্থাৎ মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব বা সত্তা নয় বরং তাকে মেশিনের জন্য ব্যবহার্য বস্তুতে পরিণত করে।

অর্থনীতিবিদগণ সাময়িকভাবে ইংল্যান্ড যে, একটি অর্থনৈতিক দিক থেকে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে শুধু এই দিকটাই বিবেচনা করলেন। অতিরিক্ত উৎপাদন যা নিজ দেশের লোক ভোগ করতে সমর্থ ছিলনা তা রপ্তানীর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হলো। ফলে ইংল্যান্ডে স্বল্প মূল্যে আমদানী ও অধিক মূল্যে রপ্তানী এই নীতি কার্যকার করা হলো যদিও এটি সব সময় সমানতালে বা সব সময় লাভজনক বা সহজ ছিলনা।

শিল্প বিপ্লব অচিরেই বেলজিয়াম, ফ্রান্স, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, গ্রীস, ইটালি ও অন্যান্য দেশে অতি দ্রুত বিস্তার লাভ করে। এই বিপ্লব যত সম্প্রসারিত হতে লাগল, রপ্তানী যোগ্য বস্তু সামগ্রী ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকল। পক্ষান্তরে বিদেশী ক্রেতার সংখ্যাও কমতে থাকল। কারণ এই প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে রপ্তানী ও আমদানীর সমতা বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছিলনা। ফলে ঐ সব দেশ আমদানী ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। আর তা হল ফ্যাক্টরী, মিল কারখানায় উৎপাদন থেমে যাওয়া তার মানে তাদের ব্যবসায় লাটে উঠা। অর্থনৈতিক ভাবে যা মৃত্যুর সামিল। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে সকল অর্থনীতিবিদ এ পরিস্থিতি এড়ানোর ব্যাপারে সব সময় ধামাচাপা দেয়ার প্রচেষ্টায় নিবেদিত ছিলেন। এর আলোকে তুলনামূলক সুবিধা, সৃজনশীল ধ্বংস, উন্মুক্ত ব্যবসায় বা মুক্ত বাণিজ্য ইত্যাদি চালু হয় যা কেনিসিয়ান অর্থনৈতিক মতবাদের প্রধান প্রেরণা হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। এ সব তত্ত্ব ও মতবাদের পিছনে রয়েছে একটি মাত্র উদ্দেশ্য তা হলো সব সময় মেশিন সচল রাখা।

শিল্পপতিগণ অল্প সময়ের মধ্যে বুঝতে সক্ষম হন যে, যদি তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের মান কমানো যায় তাহলে এসব বস্তুসামগ্রী অল্প সময়ের মধ্যে নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে ক্রেতা-ভোক্তারা পুনরায় তা কিনতে বাধ্য হবেন। এ প্রক্রিয়ায় মালামালের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে এবং চূড়ান্ত বিশ্লেষণে মিল মালিকগণই লাভবান হবেন। সেই থেকেই শিল্পপতিগণ তাদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী অতি পরিকল্পিতভাবে নিম্নমানের করে

আসছেন। অর্থাৎ উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর কাঁচা মাল এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়, যাতে অল্প খরচে নিম্নমানের বস্তু ব্যবহৃত হওয়ার ফলে তা স্বল্প সময়ের মাথেই ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। অর্থাৎ শিল্প মালিকগণের সার্বিক বিক্রয় বেশী হয় এবং তারা অধিকতর লাভবান হন। অর্থনীতিবিদগণ দাবী করে থাকেন এ প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে উন্নতমানের দ্রব্য সামগ্রী সবচেয়ে কম খরচে তৈরী করা হয় যদিও প্রকৃত পক্ষে বিষয়টি ঠিক এর বিপরীত। অর্থাৎ নিম্নমানের বস্তু ও সবচেয়ে বেশী দাম। যেহেতু বেশী বেশী বস্তু/ দ্রব্য ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ছে তাই এ ব্যবহারের অনুপযোগী দ্রব্যসামগ্রী মাটি ভরাট কাজে অথবা সমুদ্রে নিমজ্জিত করা ছাড়া উপায় থাকেনা। আর যেহেতু এ প্রক্রিয়ায় আরো মালামাল বাতিল হচ্ছে তার প্রতিবিধান কী? শুরু হলো একটি নতুন Concept বা ধারণা Recycling কিন্তু এ বাতিল মাল থেকে প্রয়োজনীয় পদার্থ আলাদা করা বা বের করা একটি অতি দুরহ কাজ। তাছাড়া এ সব বাতিল মাল যেখানে স্তূপীকৃত করা হয় ঐ জায়গা সংগত কারণেই একটি বিষাক্ত ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক স্থান হিসাবে বিবেচিত। তাই এ গুলো সম্পূর্ণরূপে পরিচ্ছন্ন ও স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে আসা অসম্ভব ব্যাপার। বাজে মালের অবশিষ্টাংশ বিষাক্ত। তাই শিল্প কারখানা চালু রাখার মাধ্যমে ক্রমাগতভাবে বর্জ্যের পরিমাণও বাড়ছে সেই সাথে ফিনিশড বস্তু সামগ্রীও প্রস্তুত হচ্ছে। অর্থাৎ শিল্প কারখানা পুরোদমে কর্মক্ষম রয়েছে। ব্যবসায়ীকদের চাহিদা এটাই।

বিশ্ব শিল্পায়িত পুঁজিবাদ আস্তে আস্তে অধঃপতনের শেষ সীমায় পৌছে যাচ্ছে। যার স্বর্ণযুগ ছিল ১৮৮৫-১৯৭০ সাল পর্যন্ত। এটির আর পুনরুত্থান ঘটানো সম্ভব হচ্ছেনা। কারণ শিল্পায়নের সফলতা মূলত: দু'টি উপাদানের উপর নির্ভরশীল আর তা হলো অধিক উৎপাদন ও মুনাফা; এ সুবিধা সংরক্ষণ করতে হলে ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবসা (Balanced Trade) করা অসম্ভব। এর মাধ্যমে কোন ধরণের মুনাফা অর্জন করা সম্ভব নয়। অবশেষে ব্যাপক সংখ্যক দেশ আমদানী করার মত আর্থিক সফলতা অর্জনে ব্যর্থ হবে। ফলে রপ্তানীকারী দেশে শিল্পের চাকা বন্ধ হয়ে যাবে। হেগেলীয় দর্শনের মূলতত্ত্ব অনুযায়ী শিল্পায়ন এমন একটি বিষয় যার ধ্বংসের বীজ এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে। এ কারণেই বলা হচ্ছে পাশ্চাত্য জীবন যাত্রার সবচেয়ে বড় ভয় হলো এই জীবনযাত্রা স্বয়ং। জোড়াতালি দিয়ে তা দীর্ঘায়িত করা যেতে পারে তবে এর অভ্যন্তরীন দ্বন্দ্ব সমূহ অপসারন করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

চন্দনন নাইর লিখেছেন, বিংশ শতকের ভোগবাদী পুঁজিবাদের মহাবিজয়ই একবিংশ শতকের বিপর্যয়ের জন্য দায়ী।

জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহতা, পরিবেশ দুষণের বিপর্যয়, সম্পদের অপব্যবহার এবং নিম্নশেষিত পরিস্থিতি পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক মডেল যা ভোগবাদী প্রবৃদ্ধির মতবাদ বা ধারণা অবশ্যই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এ পাশ্চাত্য অর্থনৈতিক মডেলের প্রবক্তরা প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে এ মডেলের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে কোন কিছু স্বীকার করতে অনীহা প্রকাশ করেন। তারা এটাও অস্বীকার করেন যে, সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের বিভিন্ন পরামর্শের বৈজ্ঞানিক বিচারে অসমর্থনযোগ্য বা বাস্তবতা বর্জিত। অন্য দিকে তারা দাবী করেন যে, মানবীয় উদ্ভাবনী ক্ষমতা এ ব্যাপারে উপযুক্ত সমাধান বের করতে সক্ষম হবে। এটা প্রকৃতপক্ষে এক ধরনের ভুল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত আর তা হলো আমরা আবার সবকিছু আগের মতই ফিরে পাব। অর্থাৎ সেই ক্রমবর্ধনশীল সম্পদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি এটাই প্রমাণ করে যে আদতেই তা অসম্ভব।

না এটা সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে এই অসম্ভাব্যতা এ পদ্ধতি যে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে, এর ফলাফলের উপর নয়। অর্থনীতিবিদদের প্রদত্ত দিক নির্দেশনা প্রকৃত পক্ষে অকার্যকর বা অস্থিতিশীল যেহেতু এ শিল্পায়ন পদ্ধতি ধ্বংস হতে বাধ্য তাই বিষয়টির মূল অনুসন্ধানে ভিন্ন ধরনের মতবাদ বা চিন্তাধারা অবলম্বন করাই হলো এর একমাত্র বিকল্প। যদিও শিল্পায়নের সুবিধা সমূহ প্রায় বিস্মৃতির পর্যায়ে চলে এসেছে অথচ মানুষ এখন বাজে বা পরিত্যক্ত মালামাল, বিষাক্ত স্থান বিপন্ন ও বিধ্বস্ত পরিবেশ, বিষাক্ত বাতাস, মাটি, পানি এবং অন্যান্য দুষিত ও ভয়াবহ পদার্থ নিয়ে মাতামাতি করছে। যার মূল্য অর্থাৎ ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে অর্থনীতিবিদরা ধারণাও করতে পারছেন না। এ বিপর্যয়ে ধনী-গরীব নির্বিশেষে সবাই সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে/ হবে যা বংশ পরম্পরায় উক্ত অধিকার সূত্রে বহন করতে থাকবে। ভবিষ্যত প্রজন্ম তাদের পিতা, প্রপিতামহকে তাদের এই অপকর্মের জন্য অভিশাপ দিতে থাকবে। আমরা জানি, পুঁজিবাদ তার শেষ অবক্ষয়ে পৌছে গেছে। যে সব ভীরু মানুষ এর উত্তরাধিকারী হবে তারা এটি বাতিল বলে ঘোষণা করবে।

মানুষের উর্বর মস্তিষ্ক অনেক সুন্দর ও বিস্ময়কর জিনিস আবিষ্কার করেছে। আবার এটাই মানব জাতির জন্য সীমাহীন দুর্ভোগ ধ্বংসের ও বিপর্যয়ের কারণ ঘটিয়েছে, প্রকৃত পক্ষে শিল্পায়নের মত এত ধ্বংসাত্মক, অপচয় মূলক, অমানবিক তত্ত্ব, পদ্ধতি নির্বাচন ও নির্ধারণ করা প্রায় অসম্ভব। আর এর ক্ষতির পরিমাণ কোনক্রমেই পূরণীয় নয়। তাই মানব জাতি সত্যই বুদ্ধিমান এটা মূল বিবেচ্য বিষয় নয়। বরং এ ব্যাপারে প্রধান প্রশ্ন হলো মানব জাতি কি তার বুদ্ধিবৃত্তি সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে? যার উত্তর নেতিবাচক বলেই প্রতীয়মান হয়।

জলোয়া-এ নুরে মোহাম্মদী বা তফছিরে ছুরা এনশেরাহ্

● হযরত মৌলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আবদুচ্ছালাম ঈসাপুরী ●

জলোয়া-এ নুরে মোহাম্মদী বা তফছিরে ছুরা এনশেরাহ্ হযরত মৌলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আবদুচ্ছালাম ঈসাপুরী (রহঃ) (১৮৮০-১৯৮৫ইং) রচিত একটি সুলিখিত গ্রন্থ। লেখক একজন উঁচু ধরণের আধ্যাত্মিক সাধক ছিলেন। মুসলমান তথা সমগ্র মানব জাতির বৃহত্তর কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন ওয়াজ ও লেখনির মাধ্যমে তাঁর পবিত্র হায়াতে জিন্দেগীতে আল্লাহর দিকে অবিরত দাওয়াত দিয়ে গিয়েছেন। উল্লেখিত গ্রন্থে তিনি পবিত্র কালামের ৯৪ তম সূরা আলাম নাশরাহ্ এর সুফিয়ানা তফসির পেশ করেছেন। সম্মানিত গ্রন্থকারের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ তাঁর অনুসৃত বানান ও বাক্যগঠন পদ্ধতি হুবহু বজায় রেখে আমরা তা এখানে প্রকাশ করছি।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যথাঃ রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা বলিয়াছেন– لولاك لما خلقت الافلاك অনুবাদঃ আল্লাহ্ তাআলা বলিয়াছেন, [এয়া মোহাম্মদ (দঃ)! আমি যদি আপনাকে সৃষ্টি না করিতাম, তবে ফলক সমূহ সৃষ্টি করিতাম না। (অর্থাৎ আপনার নুর, সৃষ্টি জগতে বিকাশ করনার্থে ফলক সমূহকে সৃষ্টি করিয়াছি। এই হাদিছে কুদছির ব্যাখ্যা পরিশিষ্টে লিখিত হইবে।)

কথিত আছে যে, হজরত হামজা (রাঃ) ও হজরত আব্বাছ (রাঃ) রছুলুল্লাহ (দঃ) কে দেখিলে বলিতেন, "এমন সুন্দর ছেলে আর কোথাও দেখি নাই; এই ছেলে আমাদের বংশের উজ্জ্বল মণি।" আবুজেহেল ও আবুলাহাব রছুলুল্লাহ (দঃ) কে দেখিলে বলিত, "এমন কুৎসিত ছেলে কখনো দেখি নাই। এই ছেলে আমাদের বংশের কলঙ্ক।" আরও রেওয়ায়েত করা হইয়াছে যে, একদিন বিবি আয়েশা (রাঃ) রছুলুল্লাহ (দঃ) কে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "এয়া রছুলুল্লাহ (দঃ)! আপনি অধিক সুন্দর না ইউছুফ (আঃ) অধিক সুন্দর?" প্রত্যুত্তরে রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছিলেন, "হে আয়েশা (রাঃ)। আল্লাহ্ তাআলা সর্বপ্রথম সৌন্দর্য্যকে সৃষ্টি করিয়া উহাকে দশ ভাগ করতঃ ১ম ভাগ দ্বারা হুর, গেলমান ও ফেরেশতাগণকে সৃষ্টি করেন; ২য় ভাগ দ্বারা চন্দ্র সূর্য্য ও গ্রহ নক্ষত্র ইত্যাদিকে সৃষ্টি করেন; ৩য় ভাগ দ্বারা স্বর্ণ রৌপ্য মণি মুক্তা ইত্যাদিকে সৃষ্টি করেন; ৪র্থ ভাগ দ্বারা উদ্ভিদ সমূহ ও তাহার ফুল সমূহ সৃষ্টি করেন; ৫ম ভাগ দ্বারা পক্ষী সমূহকে সৃষ্টি করেন; ৬ষ্ঠ ভাগ দ্বারা পশু; ৭ম ভাগ দ্বারা আগুন, পানি, মাটি ও বাতাস; ৮ম ভাগ দ্বারা পুরুষ জাতি; ৯ম ভাগ দ্বারা স্ত্রী জাতি আর ১০ম ভাগ দ্বারা একা ইউছুফ (আঃ) কে সৃষ্টি করিলেন। অতঃপর বিবি আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, "এয়া রছুলুল্লাহ (দঃ)! আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আপনি বেশী সুন্দর, না হজরত ইউছুফ (আঃ) বেশী সুন্দর, আপনি ত সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন না?" রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, "আমি যে উত্তর দিলাম তাহা কি তুমি বুঝিতে পার নাই?" বিবি আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, "আমি বুঝিতে পারি নাই" রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, "আল্লাহ্ তাআলা সর্বপ্রথম যেই সৌন্দর্য্যকে সৃষ্টি করিয়া দশ ভাগ করিয়াছিলেন, তাহাই আমার নুর।" তাহা শুনিয়া বিবি আয়েশা (রাঃ) বুঝিতে পরিলেন যে, আল্লাহ্ তাআলা সর্বপ্রথম যেই "নুরে মোহাম্মদী" সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাই সৌন্দর্য্যের মূল। হজরত ইউছুফ (আঃ) সেই সৌন্দর্য্যের দশ ভাগের এক ভাগ পাইয়া ছিলেন। এই মর্মেই জনৈক আশেকে রছুল বলিয়াছেন–

محمد مصطفیٰ اور حضرت یوسف سے کیا نسبت - وہ مطلوب زلیخا تھے یہ محبوب خدا ٹھہرے

অনুবাদঃ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর সহিত হজরত ইউছুফ (আঃ) এর তুলনা হইতে পারে কি? ইউছুফ (আঃ) জোলায়খার মাশুক ছিলেন আর মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ তাআলার মাহ্বুব।

অন্য একজন আশেক-এ-রছুল বলিয়াছেন– .

اگر نام محمد را نیاوردے شفیع آدم - نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا

অনুবাদঃ আদম (আঃ) যদি মোহাম্মদ (দঃ) এর নাম মোবারককে সুপারিশকারী করিয়া আল্লাহ তাআলার দরবারে গুনাহ্ মাফ না চাহিতেন, তবে তাঁহার গুনাহ্ মাফ হইত না ও তওবা কবুল হইত না। আর নুহ (আঃ)ও ডুবিয়া যাওয়া হইতে রক্ষা পাইতেন না।

কথিত আছে যে, হজরত আদম (আঃ) বেহেশতে থাকাকালীন ভুল বশতঃ যেই গুনাহ্ করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য তাঁহাকে বেহেশত হইতে পৃথিবীতে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং সেই গুনাহ্ মাফ হওয়ার জন্য তিনি তিনশত বৎসর কাঁদিয়াছিলেন; অশ্রু গড়াইয়া পড়ার দরুণ তাঁহার চেহারা মোবারকের দুই পার্শ্বে দাগ পড়িয়া গিয়াছিল, তবু তাঁহার তওবা কবুল হয় নাই। তিন শত বৎসর পরে আল্লাহ্ তাআলা হজরত জিব্রাইল (আঃ) কে তাঁহার নিকট গিয়া "আজান" দিতে আদেশ করেন। জিব্রাইল (আঃ) আজান দিতে আরম্ভ করিয়া যখন "ওয়াশ্হাদু আন্না মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহ্" উচ্চারণ করিলেন তাহা শুনা মাত্র হজরত আদম

(আঃ) এর স্মরণ হইল যে, আল্লাহ্ তাআলা মোহাম্মদী ছুরতে[১১] তাঁহার দেহ মোবারক সৃষ্টি করতঃ তন্মধ্যে নিজ রূহ হইতে ফুঁকিয়া দিলেন। তিনি জীবিত হইয়া চক্ষু খুলিয়া আর্শের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আর্শের প্রত্যেক "কাংগুরায়, বেহেশতের প্রত্যেক দরওয়াজায় লওহে মাহফুজে কলেমা-এ-তৈয়্যবাহ্ "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহ" লিখিত আছে দেখিয়া জিজ্ঞসা করিলেন, "এয়া আল্লাহ! "মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহ" ইনি কে? "যাঁহার নাম আপনার নামের সাথে লিখিত হইয়াছে।" আল্লাহ্ তাআলা বলিলেন, "ইনি আমার সেই প্রিয় নবী, যাঁহার মহব্বতে, যাঁহার নুর বিকাশ করার জন্য অষ্টাদশ সহস্র জগত সৃষ্টি করিয়াছি; সর্বজগতের সেরা তোমাকেও সৃষ্টি করিয়াছি। তাঁহার ওছিলা দিয়া যে কেহ আমার নিকট গুনাহ্ মাফ চায় সে যত বড় পাপীই হউক না কেন; আমি তাহার গুনাহ্ মাফ করিয়া থাকি।" আদম (আঃ), জীবন প্রাপ্তির প্রারম্ভে আল্লাহ্ তাআলার এই যে সুসংবাদ পাইয়াছিলেন, আজান শুনিয়া তাঁহার তাহা স্মরণ হইল। তখন তিনি ছেজদায় পতিত হইয়া বলিলেন, "এয়া আল্লাহ! আপনার হাবিব মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহ্ (দঃ) এর ওছিলায় আমার গুনাহ্ মাফ করুন।" তখন আল্লাহ্ তাআলা তাঁহার গুনাহ্ মাফ করিলেন। আর যদি নূহ (আঃ) তাঁহার কিস্তির তক্তায় মোহাম্মদ (দঃ) এর মোবারক নাম না লিখিতেন, তবে কেয়ামতের মত মহা জলপ্লাবনে ডুবিয়া যাওয়া হইতে তিনি ও তাঁহার কিস্তি রক্ষা পাইত না। এই মর্মে অন্যত্র বলিয়াছেন–

چه غم دیوار امت را که باشد چون تو پشتیبان - چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان

অনুবাদঃ "এয়া মোহাম্মদ (দঃ)! আপনার উম্মতের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া যাওয়ার অর্থাৎ উম্মতের পুণ্য আমল সমূহ নষ্ট হইয়া যাওয়ার পেরেসানি বা ভয় নাই যখন আপনার মত নবী উম্মতের নেগাহবান আছেন। আর সেই ব্যক্তির সাগরের ঢেউয়ের দ্বারা ডুবিয়া মরার ভয় নাই, নুহ (আঃ) যাহার কিস্তির কর্ণধার। "কোরআন হাদিছে বিশ্বাস্য দলিলাদির দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, হজরত ইছা (আঃ) ইছমে আজম পড়িয়া ফুঁক দিয়া মুর্দাকে জিন্দা করিতেন। ইহা লইয়া একজন অজ্ঞ নাছারা কোন এক উম্মতে মোহাম্মদীর সহিত তর্ক স্থলে বলিয়াছিল "আমার নবী হজরত ইছা (আঃ) মুর্দাকে জিন্দা করিতেন বলিয়া কোরআন-এ-মজিদে উক্ত হইয়াছে এবং তাহা সব উম্মতে মোহাম্মদী স্বীকার করেন[১২] কিন্তু মোহাম্মদ (দঃ) মুর্দা জিন্দা করিতেন বলিয়া কোরআনে বর্ণিত হয় নাই। সুতরাং হজরত ইছা (আঃ) মোহাম্মদ (দঃ) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" তদুত্তরে জনৈক আশেক-এ-রছুল বলিয়াছিলেন–

کرتے تھے اپنے دم پر کیا ناز ابن مریم - حضرت کے خادموں نے مردہ جلا دیا ہے

অনুবাদঃ ইছা (আঃ) মুর্দা জিন্দা করিতেন বলিয়া তিনি কি বিশেষ গৌরব অনুভব করিতে পারেন? মোহাম্মদ (দঃ) এর উম্মতের ওলিগণও মুর্দাকে জিন্দা করিয়াছেন। যথা: গাউছুল আজম হজরত আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) প্রভৃতি।

কথিত আছে যে, হজরত ইছা (আঃ) একদা গভীর কাননে ভ্রমণ করিতে গিয়া একস্থানে একটি অত্যুজ্জল সাদা রঙের গম্বুজাকারের বিরাট পাথর দেখিতে পান। তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উহার চতুর্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন যে, ইহার ভিতরে কি আছে। তখন গায়েবী আওয়াজ হইল "হে ইছা (আঃ)! এই পাথরের মধ্যে কি আছে তাহা কি আপনি দেখিতে চান?" ইছা (আঃ) বলিলেন, "দেখিতে পাইলে শুকর গুজার হইব।" তখন হঠাৎ পাথরখানা ফাটিয়া একটি দরওয়াজা হইল। সেই দরওয়াজা দিয়া তিনি দেখিলেন যে, তন্মধ্যে একজন লোক দাঁড়াইয়া নমাজ পড়িতেছেন। তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাকাইয়া রহিলেন। লোকটি নমাজ সমাপন করার পর হজরত ইছা (আঃ) কে "আচ্ছালামো আলায়কা এয়া ইছা রহুল্লাহ" বলিয়া ছালাম দিলেন। হজরত ইছা (আঃ) ছালামের জওয়াব দিয়া লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি যে ইছা, তাহা আপনি কি করিয়া জানিলেন?" লোকটি উত্তর দিলেন, "এইমাত্র আল্লাহ্ তাআলা আমাকে জানাইলেন যে, 'এখানে যে দাঁড়াইয়া আছেন, ইনি আমার নবী হজরত ইছা (আঃ); তাঁহাকে ছালাম দেন তা'জিম করেন, সম্মান করেন' এই গায়েবী আওয়াজ শুনিয়া আমি আপনাকে চিনিতে পারিয়াছি, হজরত ইছা (আঃ) পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কি মানুষ, না জ্বিন, না ফেরেস্তা? আপনি কিভাবে এই পাথরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন? ইহাতে দেখিতেছি আলো বাতাস প্রবেশ করিবার ছিদ্র মাত্রও নাই। আপনি এখানে কিরূপে, কিভাবে বাঁচিয়া আছেন? আপনি দিন রাত এবং নমাজের সময়ই বা ঠিক করেন কিরূপে? লোকটি উত্তর দিলেন, "আমি মানুষ, হজরত মুছা (আঃ) এর একজন উম্মত। আমার জননী বৃদ্ধা, দৃষ্টিশক্তিহীনা ও চলনশক্তি রহিতা ছিলেন। আমাকে অধিকাংশে সময় তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিতে হইত। আবার দরিদ্রতা বশতঃ দিন মজুরী করিয়া সংসার চালাইতাম। কোন স্থানে মজুরী ঠিক করিবার সময় মালিককে বলিতাম আমার মাতা বৃদ্ধা, দৃষ্টিশক্তিহীনা ও চলনশক্তি রহিতা। বাড়ীতে তাঁহার সেবা করার মত কেহ নাই। আপনার কাজ করিতে যাওয়ার সময় আমার বৃদ্ধা মাতাকে সঙ্গে লইয়া যাইব,

তাঁহাকে সেখানে রাখিয়া আপনার কাজ করিব এবং সময়মত মাতার সেবা করিব। এইভাবে চুক্তি করিয়া মজুরী করিতে যাওয়ার সময় মাতাকে পিঠে করিয়া লইয়া যাইতাম। তথায় মাতাকে কোন স্থানে রাখিয়া গৃহস্থের মজুরী করিতাম আর আবশ্যকমত মাতার সেবা করিতাম। কাজ শেষ করিয়া গৃহস্থ হইতে মজুরি লইয়া মাতাকে পিঠে করিয়া বাড়ী ফিরিতাম এবং খাওয়ার বন্দোবস্ত করিতাম।" এইভাবে মাতার সেবা করায় মা সন্তুষ্ট হইয়া দিবা নিশি আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করিতেন, "এয়া আল্লাহ! আমার পুত্র আমাকে যেইরূপ খেদমত করিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছে, বোধহয় এইরূপ অন্য কোন মাতার পুত্র করে নাই। অতএব, এয়া আল্লাহ আপনি আমার পুত্রকে পরহেজগার, আবেদ ও দরবেশ করিয়া দীর্ঘজীবী করতঃ দুনিয়ায় এমন সুখের জায়গায় রাখুন, যেইরূপ আর কাহাকেও রাখেন নাই।" আমার মায়ের দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হইয়াছিল। কিছুদিন পরে মায়ের ওফাৎ হইলে তাঁহার "তজহিজ ও তকফিন" (কাফন-দাফন) ইত্যাদি যথারীতি সমাধা করিলাম। মায়ের শোকে নিতান্ত অধীর হইয়া গহন কাননে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ কুব্বা সদৃশ এই পাথরখানা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ইহার চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখার সময় গায়েবী আওয়াজ শুনিলাম, "হে মাতৃভক্ত সন্তান! তোমার মায়ের দোয়ায় আল্লাহ তাআলা এই কুব্বার ভিতর তোমার জন্য বেহেশতের অনুরূপ এক বাসস্থান তৈয়ার করিয়াছেন, তুমি ইহার মধ্যে প্রবেশ কর।" অতঃপর হঠাৎ কুব্বার এক দরওয়াজা খুলিয়া গেল। আমি কুব্বার অভ্যন্তরস্থ অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া, আনন্দের সহিত তন্মধ্যে প্রবেশ করিলাম। অমনি কুব্বার দরওয়াজা বন্ধ হইয়া গেল। ইহার মধ্যে আমি স্বর্গীয় আলো, সুগন্ধিযুক্ত বাতাস ও অনির্বচনীয় শান্তি অনুভব করিতে লাগিলাম। পরমানন্দে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়ার নামাজ সমাপন করিলাম। তদবধি আমি এই কুব্বার মধ্যে বেহেশত সুলভ সুখে অবস্থান করিতেছি। ক্ষুধা পাইলে স্বর্গীয় খাদ্যদ্রব্যাদি আমার সামনে হাজির হয় আর আমি পরিতৃপ্তির সহিত উহা খাইয়া আল্লাহর শোকর করি। খাদ্য হজম হওয়ার পর কয়েকটি সুগন্ধিযুক্ত ঢেকুর উঠিয়া যায় অথবা ঘর্ম হয়। আর পায়খানা প্রস্রাবের দরকার হয় না। পিপাসা হইলে শাহাদৎ অঙ্গুলি চুষিয়া স্বর্গীয় পানীয় তুল্য মধুর পানি পান করি। সূর্যোদয় ও অস্তকালে কুব্বা লোহিতবর্ণ ধারণ করে, তদ্বারা আমি দিবা রাত্রি ও নমাজের সময় নির্ধারন করিতে পরি। এখানকার বাতাস এমন আনন্দ ও স্ফূর্তিদায়ক যে, আমার শরীরে আলস্য বা তন্দ্রার ভাব থাকে না। সুতরাং সর্বদা আমি সজাগ অবস্থায় থাকিয়া আল্লাহ তাআলার জিকর, ফিকর, তহবীহ ও তাহলীল ইত্যাদি এবাদত সমাপন করিতে পারি।"

ফুটনোট– (১১) ওলি মেরাশেদগণ বলেন যে, "আল্লাহ" ও "মোহাম্মদ" আরবী শব্দদ্বয়কে তোগরা ছুরতে অংকিত করিলে মানুষের চেহারার ছুরত হয়।

সুতরাং মানুষের চেহারা সর্বাপেক্ষা অধিক সুন্দর। যথা আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন– لقد خلقنا الانسان فى احسن تقويم অনুবাদঃ নিশ্চয় আমি মানুষকে সর্বাপেক্ষা অধিক সুন্দর গঠনে সৃষ্টি করিয়াছি। (কোরআন)।

এই কারণে কোন কোন ওলি মোর্শেদ মুরিদকে নিজ (তছাওয়ার) চেহারার করিতে তালিম দিয়া থাকেন। মোহাম্মদ (দঃ) এর ওছিলায় এই ছুরতে মোহাম্মদীর উপর রহমত জেয়াদা করার মোনাজাত করিতে শিক্ষা দিয়া থাকেন। মানুষ সোজানু হইয়া বসিলে "মোহাম্মদ" শব্দের আকার হয়। ডান কিংবা বাম পার্শ্ব হইয়া শুইলেও "মোহাম্মদ" শব্দের আকার হয়। কবরে লাশকে ডান পাশ্বের উপর শোয়াইলেও "মোহাম্মদ" শব্দের আকার হয়। কামেল ঈমানদরগণ দুনিয়ায় যেই ছুরতে মোহাম্মদীতে ছিলেন, কবরেও সেই মোহাম্মদী ছুরতে থাকিবেন এবং এই ছুরত লইয়া হাশরে উঠিবেন। তাঁহাদিগকে "উম্মতে মোহাম্মদী" বলিয়া সকলেই চিনিতে পরিবেন। ফেরেশ্তাগণ তাঁহাদিগকে সম্মান ও সাহায্য করিবেন। রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাদিগকে নিজ উম্মত বলিয়া চিনিতে পরিবেন এবং ওলি মোর্শেদগণ ও নাবালেগ অবস্থায় ওফাৎ প্রাপ্ত শিশুগণ এবং অন্যান্য সুপারিশ করার ক্ষমতা প্রাপ্ত লোকগণ তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিয়া তাঁহাদের সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী হইবেন। তাঁহারা রছুলুল্লাহ (দঃ) এর হাতে অথবা ওলি-মোর্শেদ কিংবা নাবালেগ শিশুগণের হাতে "হাউজে কাউছারের" অমৃততুল্য পানি পান করিবেন। রছুলুল্লাহ (দঃ) এর অথবা নিজ ওলি-মোর্শেদের শামিয়ানা তলে কিংবা আল্লাহ তাআলার রহমতের মেঘের, অথবা আর্শের ছায়াতলে শান্তিময় স্থান পাইবেন। হাশরের সেই একদিন দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমান হইবে। সূর্য্য মাথার উপর এক নেজার বা বল্লম পরিমাণ উর্দ্ধে থাকিবে এবং নিজ সম্মুখদিক বা বক্ষস্থল (যাহা এখন উপরের দিকে আছে সেই দিন তাহা) জমিনের দিকে করিবে। সূর্য্যের ভীষণ তাপে জমি আগুনে উত্তপ্ত লাল লোহার মত হইয়া যাইবে। সেই দুর্বিসহ উত্তাপে মানুষ ঘামে ডুবিয়া যাইবে– মোমের মত গলিতে থাকিবে; পিপাসায় প্রাণ ছটফট করিবে অথচ মরিবে না। এই ভীষণ যন্ত্রণা পূর্ণ দিবসে যাঁহারা মোহাম্মদ (দঃ) এর আশেক, তাঁহারা স্বর্গীয় পোষাক, আরোহনের জন্য বোরাক, হাউজে কাউসারের স্বর্গীয় পানি,

রছুলুল্লাহ অথবা পীর-মোর্শেদের শামিয়ানার সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় পাইবেন। হাশরের সুদীর্ঘ দিন তাঁহাদের নিকট ২৪ ঘন্টায় একদিন বলিয়া বোধ হইবে। তাঁহারা আল্লাহ তাআলাকে পূর্ণিমা রজনীর পূর্ণ শশধরের ন্যায় স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন যাহা দুনিয়া ও বেহেশতের যাবতীয় নে'মত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা নিজ নিজ আমলনামা ডান হাতে পাইবেন। নেকী-বদি ওজনের সময় মোহাম্মদ (দঃ) এর প্রতি যাঁহারা দরূদ ছালাম প্রেরণ, তাঁহার প্রতি মহব্বত ও সম্মান প্রদর্শন, তাঁহার গুণকীর্তন ও মাহাত্ম্য বর্ণনা, তাঁহার রূহ মোবারকে ছওয়াব পৌছান, তাঁহার প্রচারিত দীন-এ-ইছলাম ও ছুন্নত অনুযায়ী আমল ও ইহার প্রচার ইত্যাদি পুণ্যজনক কাজ করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় রছুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট আমানত ছিল। তাহাদের কাহারও নেকীর পাল্লা হালকা হইলে রছুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট তাঁহার আমানতী যেই ছওয়াব ছিল, তিনি তাহা নেকীর পাল্লায় দিবেন, তখন নেকীর পাল্লা ভারী হইবে। আর সেই ব্যক্তি বেহেশতে যাওয়ার অনুমতি পাইবেন।

আর যাহার আল্লাহ রছুল (দঃ) ও দীন-এ-ইছলামের উপর ঈমান আনে নাই, পশুত্ব ও শয়তানি জনিত নানা প্রকার পাপ কার্য্যাদি করিয়াছে তাহার দুনিয়াতে যে মোহাম্মদী ছুরতে ছিল, তাহা থাকিবে না বরং শিয়াল, কুকুর, শুকর, হাতী, বাঘ, ভল্লুক, সর্প ইত্যাদি যে কোন হিংস্র জন্তুর মন্দ স্বভাবানুযায়ী কার্য্য করিয়াছিল, আলমে মেছালে, কবরে ও হাসরে তাহারা সেই পশুর ছুরতে ছুরত প্রাপ্ত হইবে। অথবা পিচাশ, রাক্ষস প্রভৃতি জ্বীন শয়তানের আকার প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং তাহাদিগকে ফেরেশতাগণ ও নবী-রছুলগণ মুসলমান ও উম্মত বলিয়া চিনিতে পারিবেন না। সুতরাং তাহারা ফেরেশতা, নবী-রছুল, ওলী-মোর্শেদ কাহারো সাহায্য ও সুপারিশ পাইবে না। অতএব তাহারা হাশরের ময়দানে ভীষণ উত্তাপে দগ্ধ প্রায় হইবে, পিপাসায় ছটফট করিতে থাকিবে, হাউজে কাউছারের পানি পাইবে না। নবী-রছুল, ওলী-মোর্শেদ কাহারো শামিয়ানা তলে অথবা আল্লাহ তাআলার রহমতের মেঘের ছায়ায় অথবা আর্শতলে আশ্রয় পাইবে না। তাহাদের আমলনামা বাম হাতে দেওয়া হইবে পাপকার্য্য ইত্যাদির কঠোরভাবে হিসাব করা হইবে; অতঃপর তাহাদিগকে দোজখে যাওয়ার হুকুম দেওয়া হইবে। মোহাম্মদ (দঃ) পোলছেরাতের গোড়ায় গিয়া দোজখের ভীষণ অগ্নিশিখার উপর অতি সূক্ষ্ম ও ধারাল পুল দেখিয়া অস্থির হইবেন। তাঁহার উম্মতগণকে অতি ভীষণ বিপদ সংকুল পোল পার করাইয়া বেহেশতে দাখিল করার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট আকুল প্রার্থনা করিবেন। অশ্রুতে তাঁহার বক্ষ মোবারক ভাসিয়া যাইবে। আল্লাহ তাআলা বিশেষ রহমত করিয়া তাঁহার পুণ্যবান উম্মতগণকে পোল পার করাইবার জন্য বহু উট, বোরাক ইত্যাদি পাঠাইবেন। তাহাতে আরোহন করিয়া পোল পার হইয়া তাঁহার বহু উম্মত বেহেশতে যাইবেন। অতঃপর আরও বহু উম্মত ঠেকিয়া রহিয়াছে দেখিয়া তিনি দ্বিতীয়বার আল্লাহ তাআলার নিকট তাঁহাদিগকে পার করানোর সুপারিশ করিলে, আল্লাহ তাআলা বলিবেন, "এয়া রাছুলুল্লাহ (দঃ)! আপনার উম্মতের আর কোন ওছিলা বাকি নাই, যদ্বারা আমি তাঁহাদিগকে পার করাইয়া বেহেশতে পৌছাই।" তখন রছুল (দঃ) বলিবেন, "এয়া আল্লাহ! আপনি রহমানুর রহিম, গফুরুর রহিম ও জুল ফজলিল আ'জিম, আপনার অশেষ করুণা, বিশেষ রহমত ও খাছ ফজল ও করম গুণে আপনি তাঁহাদিগকে পার করাইতে পারেন।" তখন আল্লাহ তাআলা হজরত জিব্রাইল (আঃ) কে বলিবেন "হে জিব্রাইল! তোমার নুরানী পাখা পোল ছেরাতের উপর বিছাইয়া দাও। আমার হাবিব মোহাম্মদ (দঃ) এর উম্মত গণ পাখার উপর দিয়া পার হইয়া বেহেশতে গমণ করুক।" অতঃপর রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার সেই সব উম্মতকে (যাঁহারা মোহাম্মদী-ইনছানি ছুরতে হাসরে উপস্থিত থাকিবেন।) জিব্রাইলের পাখার উপর দিয়া বেহেশতে পাঠাইয়া দিবেন। আর যাহাদের গুনাহর দরুণ ছুরত বিকৃত হইয়া যাইবে; মোহাম্মদী ছুরত থাকিবেনা, তাহাদিগকে রছুলুল্লাহ (দঃ) এর উম্মত বলিয়া চিনিতে পারিবেন না। সুতরাং তিনি সুপারিশও করিবেন না। সেই হতভাগ্য লোকগণ দোজখে পতিত হইবে। অতঃপর তাহাদের মুক্তি আল্লাহর খাছ ফজল ও করম এবং রছুলুল্লাহ (দঃ) এর সুপারিশের উপর নির্ভর করিবে। এই ফুটনোটে লিখিত সমুদয় বর্ণনা কোরআন, হাদিছ, তফছির, আকায়েদ ও ফেকার কিতাব সমূহের সংক্ষিপ্ত সারমর্ম অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। সংক্ষেপ করনোদ্দেশ্যে দলিল সমুহ লিখিত হয় নাই। বিশেষ করিয়া এই বর্ণনা সমুহ ইমাম পাঞ্জালি (রাঃ) এর "দাকায়েকুল আখবার" নামক কেতাব হইতে লিখিত হইয়াছে।

ফুটনোট (১২) (মোহাম্মদ (দঃ) ও মুর্দা জিন্দা করিয়াছেন বলিয়া হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে। তাহা পরিশিষ্টে লিখা হইবে।) তখন মোহাম্মদ (দঃ) মাতৃগর্ভে ছিলেন। সুতরাং আল্লাহ তাআলা তাঁহার কেবলা, কা'বা গৃহকে রক্ষা করার জন্য এই মো'জেজা ব্যক্ত করেন। ইহা রছুল (দঃ) এর এরহাছ শ্রেণীর মো'জেজা বিশেষ। দুনিয়ায় নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে কোন নবী হইতে মো'জেজা জাহির হইলে তাহাকে "এরহাছ" বলে। (চলবে)

রোজার রহস্য

মূল: ইবনুল আরবী
অনুবাদ: সালেহ জঙ্গী

[আল ফুতুহাত আল মক্কিয়াহ হতে]

তোমরা যারা কান্নার ছল করে কর হাস্য
তোমরাই বিবাদ, তোমরাই বাদী এই আমাদের ভাষ্য

রোজা কি বিরতি শুধু উত্তরণ ছাড়া
নাকি উত্তরণ কেবল, নিয়ন্ত্রণ হারা?

তাদের জন্য দু'টোই একসাথে
যারা তওহীদের নামে শিরকে মাতে

বুদ্ধি বন্দী ছলনার জালে
ফাঁদ ছাড়া কর্মের স্বাধীনতা পায়না কোন কালে

কর্মের স্বাধীনতা হতে বুদ্ধি ভ্রষ্ট
শরিয়ার কর্তন তাতে অতি স্পষ্ট

প্রমাণে ব্যর্থ হয়ে তারা করে আত্মসমর্পন
তাদের বিশ্বাস হল প্রত্যয়হীন অর্জন

ধ্রুবতারা দেয় ইশারা দূর সুদূরের পানে
আকাশ জুড়ে সাঁতার কাটা নূর ফিরিশতার টানে

তোমার জন্য না হলে তো হতাম নাতো আমি
তোমার জন্য না হলে তো হতাম অন্তর্যামী

ইন্দ্রিয়-সুখ ভুলে গিয়ে রোজা রাখ লাগাতার
প্রভু তোমায় নেবেন কাছে, নেবেন সকল কাজের ভার

রোজার মত রোজা রাখ নিয়ত কর তুষ্টি
এ রোজাতেই হাসিল হবে পূর্ণ পরিপুষ্টি

একটি প্রাণী নামে যখন তোমার বাসস্থানে
ধ্যান কর, জানতে পাবে রোজার আসল মানে

" রোজার মত আর কিছু নেই", বলেন বিধান দাতা
তার ওপর ধ্যান কর, খোল হৃদয় খাতা
কারণ সেটাই তোমার 'কর্মবিহীন কাজ'
যা করেছ কোথায় সেসব, কিসের দাবি আজ?

মূলের দিকে ফিরে গেছে বিষয়টুকু যখন
প্রভুর হাতেই এখন তোমার সকল নিয়ন্ত্রণ

যদি তুমি চিন্তা কর রোজার নীতি নিয়ে
বুঝতে চাহ অর্থ তাহার আপন বুদ্ধি দিয়ে

তোমার রোজার বার্তা নিয়ে আসবে প্রভুর দূত
পড়বে ধরা তাতে যদি থাকে কোন খুঁত

রোজার মালিক আর কেহ নন স্বয়ং বারি তা'লা
তবু তুমি মরতে বস নিয়ে ক্ষুধার জ্বালা

যেমন আচার করেছিল প্রথম তোমার রুহু
তেমন সাজে সাজিয়েছেন তোমার গঠন প্রভু

তোমার গড়ন তাঁর অবদান তসবিহ পড় তাঁর
তিনি ছাড়া সেই ক্ষমতা কেইবা রাখে আর?

তোমার দেহ বিছানা এক এই পৃথিবীর মত
উৎসভূমি চোখের জলে সিক্ত অবিরত

দু'য়ের মাঝে মেলে সৃষ্টির রহস্য ভান্ডার
তোমার মাঝে আছে নাকি সেই আলামত তার?

বিনম্র চিত্তে যখন গেলে তুমি প্রভুর কাছাকাছি
বলেন তিনি,'হে বান্দা আমি তোমার তরে আছি'

ঐশী হুকুম পেয়ে কলম লিখতে থাকে তখন
মাহফুজে সকল কিছুর সঠিক বিবরণ

সকল কিছুর উৎস তুমি, তাঁহার উৎস নও
কারো খুবই কাছাকাছি, কারো হতে অনেক দূরে রও

প্রলোভনের লক্ষ বস্তু বিশ্ব জগৎ জুড়ে
নিজকে রাখ সেসব হতে লক্ষ যোজন দূরে

ধরে থাক মূলের রশি তাঁরই মর্জি মতে
স্মরণ-বিমূখ হলে তুমি হারিয়ে যাবে পথে

এ জ্ঞান পাওয়া গেছে প্রভুর তরফ হতে
পাক দরবার মুক্ত সদা সকল মিথ্যা হতে

মহাজ্ঞানী পরম প্রভু সকল জ্ঞান তাঁর
যা জেনেছি সকল কিছু তাঁহার উপহার

সব প্রশংসা তাঁরই তরে আর কাহারো নয়
সরিয়ে আঁধার দিলেন যিনি আলোর পরিচয় ।

রোজা হচ্ছে একাধারে বিরতি ও উত্তরণ

আল্লাহ আপনাকে হিফাযত করুন। জেনে রাখুন রোজা একাধারে বিরতি ও উত্তরণ। জনৈক ব্যক্তি বলেছেন: "দিন পৌঁছেছে পূর্ণ উচ্চতায় (সামা)" যখন তা ছুঁয়েছে সর্বোচ্চ শিখর। কবি ইমরুল কায়েস বলেছেন:

'দিন যখন উচ্চতায় পৌঁছেছিল আর এর উত্তাপ ছিল প্রচণ্ড' অর্থাৎ দিনের তখন পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। এটার কারণ হল অন্য সব ইবাদতের তুলনায় রোজার রয়েছে উচ্চতর মর্যাদা, একে বলা হয় 'সওম'। আল্লাহ সওমের মর্যাদাকে বিশেষ স্তরে উন্নীত করেছেন। অন্যসব ইবাদত এর ধারে কাছে ঘেঁষতে পারেনা। আমরা এ নিয়ে আলোচনা করব। আল্লাহর কোন বান্দা রোজার মালিক নয় যদিও রোজার মাধ্যমে তারা তাঁরই ইবাদত করে। রোজাকে বরং তিনি নিজের দিকেই সম্পৃক্ত করেছেন। এর আংশিক স্বীকৃতি মেলে রোজার পুরস্কারের ঘোষণায় যেখানে তিনি বলেছেন এর পুরস্কার তিনি নিজের কুদরতী হাতেই দেবেন, পাশাপাশি জানিয়ে দিয়েছেন এটা কিন্তু অন্য কিছুর মত নয়।

হাকীকতে রোজা 'কর্ম-বিহীন কাজ' (non-action), কোন কর্ম (action) নয়: প্রকৃত পক্ষে রোজা 'কর্ম-বিহীন কাজ' কোন 'কর্ম' নয়। 'সাদৃশ্যের অস্বীকৃতি' একটি নেতিবাচক গুণ। অতএব এর সাথে আল্লাহর সম্পর্ক খুবই জোরদার। সর্বশক্তিমান আল্লাহ সুবহানু তা'আলা নিজের সম্পর্কে বলেন: 'তাঁর মত আর কিছুই নেই।' (৪২:১১) আল্লাহ বলেছেন তাঁর সদৃশ আর কিছুই নেই। যুক্তি প্রমাণে এ কথা মোটেই বলা যাবে না যে তাঁর মত আর কিছু আছে। শরীয়া'ও একই কথা বলে। আন নাসাঈ বর্ণনা করেছেন। আবু উমামা বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সাক্ষাৎ করে বললাম, 'আপনার তরফ হতে আমাকে বিশেষ কিছু নসিহত করুন'। তিনি বললেন, 'তুমি অবশ্যই রোজা পালন করবে। এর মত আর কিছুই নেই।' তিনি বলেছেন, আল্লাহ বান্দার জন্য যে সকল ইবাদত নির্ধারিত করেছেন সেগুলোর কোনটির সাথে রোজার তুলনা হয় না।

যাঁরা একে নেতিবাচক গুণসম্পন্ন বলে স্বীকার করেন– কারণ রোজা এমন কতগুলো কাজ হতে বিরত থাকতে বাধ্য করে, যা করলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যায়– তাঁরা অবশ্যই জানেন যে রোজা অন্য কিছুর মত নয়। বোধগম্য অস্তিত্বের মাধ্যমে বর্ণনা করার মত এর কোন উৎস-সূত্র নেই। মহান আল্লাহ সুবহানু তা'আলা তাই ঘোষণা করেন: "রোজা আমার"। প্রকৃত পক্ষে এটা কোন ইবাদত বা 'কর্ম' নয়। একে 'কর্ম' হিসাবে বর্ণনা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে যেভাবে 'অস্তিত্ব'-এ গুণটি আল্লাহর প্রতি আরোপ করা হয়ে থাকে। আমরা বুঝতে পারি, আল্লাহর প্রতি 'অস্তিত্ব' নামক গুণারোপণ তাঁর সত্তার অস্তিত্বের সাথে সাদৃশ্যপূর্ব– তা কিন্তু আমাদের 'অস্তিত্বের' মত নয়। "তাঁর সদৃশ কিছুই নেই" (৪২:১১)

আদম সন্তানের সকল কাজই তার। রোজা হল একমাত্র ব্যতিক্রম। রোজার মালিক আল্লাহ।

আসুন আমরা আল্লাহর হাবীব রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর স্বর্গীয় বাণী শুনি: (হাদিসে কুদসী) সহিহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে: হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন: প্রতিটি কর্ম আদম সন্তানের নিজের, একমাত্র রোজা ছাড়া। এটা আমার, আমিই তাকে এর প্রতিদান দেই। রোজা ঢাল স্বরূপ। তোমাদের মধ্যে যে রোজা রাখে সে যেন কোন অশ্লীল কথা না বলে কিংবা খুবই উচ্চস্বরে কোন কথা না বলে। কেউ যদি তাকে অভিশাপ দিতে চায় অথবা ঝগড়া বিবাদ বাধাতে চায় তখন সে যেন বলে আমি রোজাদার। তাঁর শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মেশকের সুগন্ধির চেয়েও খুশবুময়। রোজাদারের জন্য দু'টি খুশী। একটি খুশী যখন সে ইফতার করে দ্বিতীয়ত যখন সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে তখন সে রোজার খুশিতে খুশী হয়।" (মুসলিম ১৩:১৬৩)

সাদৃশ্যের এই অস্বীকৃতি যত উন্নত স্তরে উপনীত হবে রোজাদারের খুশির পরিমাণও তত বেশি হবে।

আন নাসাঈ বর্ণিত হাদিস অনুযায়ী যেহেতু রাসূলে হাবিব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম রোজাকে অন্য কিছুর সদৃশ বলতে অস্বীকার করেছেন এবং আরও বলা হয়েছে "আল্লাহর সদৃশ আর কিছুই নেই" তাই রোজাদারের সাথে প্রভুর সাক্ষাৎকেও বলা হয়েছে "তার মত আর কিছুই নেই"। রোজাদার রোজার মাধ্যমেই প্রভুকে দেখে। প্রভু একাধারে স্রষ্টা ও দৃষ্ট। তাই হুজুর পুরণুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন "সে রোজার খুশিতে খুশি হয়" এ কথা বলেন নি যে "সে তার প্রভুর সাক্ষাতে খুশি হয়।" আনন্দ নিজের কারণে আনন্দিত হয়না বরং রোজার আনন্দেই তাকে আনন্দিত করে তোলা হয়। যার দৃষ্টিতে আল্লাহ বিরাজমান যখন সে তাকায় আর তাঁর ধ্যান করে তখন সে তাঁকে দেখার মাধ্যমে নিজেকেই দেখে।

সদৃশের সর্ব প্রকার ধারনাকে প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমেই রোজাদার আনন্দ অনুভব করে। রোজা ভঙ্গ করে ইফতার

করার সময় দুনিয়ায় সে অপার আনন্দ লাভ করে কারণ যে খাদ্য গ্রহণের জন্য তার জৈব আত্মা উদগ্রীব থাকে তখন তার পরিতৃপ্তি ঘটে। যখন রোজাদার বুঝতে পারে তার জৈব আত্মা খাদ্যের প্রত্যাশী এবং তার পরিপুষ্টিও ঘটে খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে আল্লাহর অবধারিত হালাল উপায়েই সে তখন তার চাহিদা পূরণ করে। এভাবে সে এমন এক মর্যাদার স্তরে উন্নীত হয় যাকে বলা যায় অভ্রান্ত। সে দেয় যেমন আল্লাহর হাতে তেমনি আল্লাহকে দেখে আল্লাহরই চোখে। এজন্যই সে ইফতারের সময় আনন্দ অনুভব করে এবং আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময় "রোজার খুশিতে খুশি" হয়।

রোজা হল সামাদিয়া সিফাত এবং নিজেই এর পুরস্কারঃ হাদিসের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্টের ব্যাখ্যা, 'রোজাদার' এ বিশিষ্ট বিশেষণে বিশেষায়িত করে বান্দার বর্ননা দেয়া হয়েছে। বান্দার রোজার কথা স্বীকার করে নিয়ে আল্লাহ তা নিজের ওপর আরোপ করেছেন। বলেছেন 'রোজা আমার।' অর্থাৎ এ রোজার বৈশিষ্ট্য এমন এক গুণে গুনান্বিত যাকে বলা যায় অন্তহীন সময় পর্যন্ত আত্মনির্ভরশীলতা। (সামাদিয়া) খাদ্যের সাথে এর সম্পর্ক সম্পূর্ণ তিরোহিত। "এটা শুধু মাত্র আমার, যদিও বান্দা, আমি তোমার ওপর এ রোজা আরোপ করি।

তোমার ক্ষেত্রে খাদ্য-বিচ্ছিন্নতার এ বৈশিষ্ট্যটি সীমিত সময়ের জন্য আরোপিত। যে বিচ্ছিন্নতা আমার স্বকীয় মহিমার সাথে বিজড়িত তার সাথে সেটা তুলনীয় নয়।" আমি বলেছি, "আমি বান্দাকে এর পুরস্কার দেই।" আল্লাহ রোজাদারকে তার প্রতিদান দেন যখন রোজা প্রভুর সামনে পেশ করা হয়। প্রভুর সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটে এমন এক অর্জিত গুণের মাধ্যমে যে গুণেরও কোন সাদৃশ্য অন্য কোথাও নেই। এ ব্যাখ্যা আবু তালিব আল মক্কীর বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যিনি ছিলেন রোজাদারদের মধ্যে অগ্রণী। "পরিশ্রমণকারীর জন্য পরিশ্রমণই পুরস্কার" (অর্থাৎ সাধনাই সাধনাকারীর পুরস্কার)। হাদিসের এ অংশে সে কথাই বলা হয়েছে।

সদৃশ বিহীন আল্লাহ ও সাদৃশ্যহীন রোজার মধ্যে পার্থক্যঃ অতঃপর তিনি বলেনঃ "রোজা ঢাল স্বরূপ"। এবং এটা এক রক্ষা কবচ। তিনি বলেছেন 'আল্লাহ কে ভয় কর।' (২:১৯৪) অর্থাৎ তাঁকে একমাত্র রক্ষাকর্তা হিসাবে গ্রহণ কর আবার তাঁর জন্যও রক্ষাকারী হও। রোজাকে রক্ষাকারী হিসাবে তিনি তাঁর অবস্থানে উন্নীত করেছেন। "তাঁর সদৃশ কোন কিছু নেই" একই ভাবে রোজার সদৃশ আর কোন ইবাদতও নেই। এটা স্থায়িত্ব বা অস্তিত্বের বিষয়। রোজা কর্ম-বিহীন কাজ। এটা অনস্তিত্ববান বোধগম্যতা ও নেতিবাচক সিফাত। এর কোন সদৃশ নেই। তার অর্থ এ নয় যে, রোজার মত আর কিছুই নেই। আল্লাহর গুণাবলীর বিষয়ে সাদৃশ্যের অস্বীকৃতি ও রোজার বিররণ যেভাবে এসেছে উভয়ের মাঝে তারতম্য এটাই।

রোজাদারের জন্য অশ্লীলতা, হট্টগোল ও ঝগড়া বিবাদ নিষিদ্ধঃ বিধানদাতা রোজাদারদের জন্য কিছু কাজ অবৈধ ঘোষণা করেছেন। এ নিষেধাজ্ঞা কর্মহীনতা ও নঞর্থক সিফাত। তিনি বলেন, "সে যেন কোন অশ্লীল উচ্চারণ না করে কিংবা কোন হৈ চৈ।" এ ক্ষেত্রে তিনি কোন কাজ করার নির্দেশ দেননি, কিন্তু কিছু কাজের বর্ণনা দিয়ে তা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। রোজা হল কর্ম-শূণ্যতা (non-action), তাই রোজা ও রোজাদারদের জন্য নিষিদ্ধকৃত কাজের মধ্যকার সম্পর্ক যথাযথ। এরপর নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কেউ যদি তাকে অভিশাপ দেয়, মন্দ কথা বলে বা তার সাথে ঝগড়া ফ্যাসাদে লিপ্ত হতে চায়, সে যেন তখন বলে, "আমি রোজাদার" অর্থাৎ আমি ঐ কাজগুলো বর্জন করেছি যা একজন বিবাদকারী সৃষ্টি করতে চায়। প্রভুর নির্দেশের কারণে রোজাদার এ সমস্ত কর্ম হতে নিজেকে বিরত রাখে। সে বলে এ কাজগুলো তার নয়। অর্থাৎ অভিশাপ দেয়ার, মন্দ কথা বলার বা ঝগড়া বিবাদ করার গুণটি তার মাঝে অবশিষ্ট নেই। বিবাদকারী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সে তা প্রয়োগ করতে পারে না।

রোজাদারের মুখের গন্ধঃ আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "তাঁর শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, রোজাদারদের পরিবর্তিত শ্বাস প্রশ্বাস" এটা হল শ্বাস প্রশ্বাসের ফলে অবশিষ্ট রোজাদারদের মুখের পরিবর্তিত ঘ্রাণ। প্রভুর আদেশে অনুপ্রাণিত হয়ে রোজাদার কিছু উত্তম বাক্য উচ্চারণ করে। এ উত্তম শব্দ গুলো হলঃ "আমি রোজা রেখেছি।" এ শব্দ গুলো ও রোজাদারদের প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাস "উত্থানের দিনে খুবই মধুর শোনাবে" এ দিন আল্লাহ রব্বুল আলামীনের হুকুমে প্রত্যেক বান্দা আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হবে।

সে দিন শুধু আল্লাহর নামই উচ্চারিত হবে। 'আল্লাহ' যাঁর সমতুল্য বা সদৃশ কোন কিছু নেই, এ মহান নামটি শুধু তাঁরই হবে। এ অবস্থার সাথে রোজার ঐক্য আছে কারণ রোজার মত অন্য কোন ইবাদত নেই।

তিনি বলেছেনঃ "মেশকের সুগন্ধির চেয়ে আরো বেশি সুগন্ধময়।" মেশক একটি অস্তিত্বশীল বস্তু যার সুগন্ধি অনুভব করা যায়। প্রতিটি সুস্থ মানুষ তার ঘ্রাণ অনুভব করতে পারে।

রোজাদারের মুখের পরিবর্তিত গন্ধ আল্লাহর কাছে তার চেয়েও বেশি সুগন্ধময়। কারণ গন্ধ সম্পর্কে আল্লাহর সন্তাগত অনুভব সৃষ্টিজগতের অন্য কারো ঘ্রাণানুভূতির সাথে তুলনীয় নয়। আমাদের জন্য যা অস্বস্তিকর রোজাদারের পরিবর্তিত নিঃশ্বাসের ঘ্রাণ আল্লাহর কাছে মেশক আম্বরের সুগন্ধের চেয়েও অধিক আদরনীয়। এ ঘ্রাণ আল্লাহ বর্ণিত 'রুহ' এর মত। কারণ তার শ্বাস প্রশ্বাস হতে উৎপন্ন হয়না।

মক্কার হারাম শরীফের মিনারায় মুসা বিন আল কাব্বাব এর সাথে ইবনে আরাবীর সাক্ষাৎকার: এ রকম এক আশ্চর্য ঘটনার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল। হারাম শরীফের হাজাওয়ারা দরজায় আমার সাথে মুসা বিন মুহাম্মদ আল কাব্বাব এর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁর সাথে খুবই দুর্গন্ধযুক্ত কিছু খাবার ছিল। তখন আজান হচ্ছিল। আমি হাদিস শরীফে পড়েছি আদম সন্তানের কাছে যা দুর্গন্ধময় ফিরিশতাদের কাছেও তা দুর্গন্ধযুক্ত। তাই পিয়াঁজ, রসুন ইত্যাদির গন্ধ সহকারে মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাতে আমি স্থির করলাম তাঁকে ফিরিশ্তাদের খাতিরে এ দুর্গন্ধযুক্ত খাবার মসজিদ থেকে সরিয়ে ফেলতে বলব। সে রাতেই আমি আদিষ্ট হলাম: তাঁকে সে খাদ্য সম্পর্কে কোন কিছু বলোনা। এর গন্ধ আমার কাছে তেমন নয় যেমন গন্ধ তোমরা অনুভব কর।" যথারীতি তিনি পরদিন আমাদের কাছে এলে আমি তাঁকে আমার স্বপ্নের কথা খুলে বললাম। তিনি কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে সিজদা পেশ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন: "শায়খ, এতদসত্ত্বেও শরিয়তের আদব রক্ষা করাই বেহতর।" এই বলে তিনি মসজিদ থেকে খাবারগুলো সরিয়ে ফেললেন। আল্লাহ তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন।

স্বর্গীয় প্রকৃতির কাছে দুর্গন্ধ অপছন্দনীয়: যে কোন সুস্থ প্রকৃতির মানুষ ও ফিরিশতার কাছে দুর্গন্ধ অপছন্দনীয়। দুর্গন্ধের প্রকৃত স্বরূপ শুধুমাত্র আল্লাহই জানেন। কিছু সংখ্যক প্রাণী আছে যারা দুর্গন্ধকে গ্রহণ করতে পারে। ঐ সকল প্রাণীর বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন কিছু মানুষের কাছেও দুর্গন্ধ সহনীয়। ফিরিশতাদের ব্যাপারটি সে রকম নয়। তাই হাদিস শরীফে বলা হয়েছে: "আল্লাহর কাছে"। একজন রোজাদার যেহেতু সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ তাই তার নিজের ও অন্যের কাছে মুখের দুর্গন্ধ দুর্গন্ধ বলেই বোধ হয়।

কোন প্রাণী কি এমন আছে যারা মুহূর্তের জন্য হলেও দুর্গন্ধকে চূড়ান্তভাবে পছন্দনীয় মনে করে? আমরা এ কথা কখনোও শুনিনি। আমরাা বলেছি 'চূড়ান্তভাবে'। কারণ কারো কারো কাছে তাদের গঠন প্রকৃতির কারণে মেশক ও গোলাপের গন্ধও অপছন্দনীয়। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষের কাছেই গোলাপ ও মেশক খুশবুময়। যাদের কাছে এসব পছন্দনীয় খুশবু নিন্দনীয় মনে হয় তাদের প্রকৃতি অবশ্যই ব্যতিক্রম ধর্মী।

আল্লাহর কাছে যেহেতু দুর্গন্ধযুক্ত কোন কিছুই নেই, আমি জানিনা তিনি কোন মানুষকে গন্ধের সমতা ভিত্তিক কোন ধারণা/ বোধ দান করেছেন কিনা। আমরা এ বিষয়ে কোন পরীক্ষা নিরীক্ষা করিনি আর কেউ আমাদেরকে এ বিষয়ে অবহিতও করেনি। অধিকন্তু বলা হয়েছে কামিল মানুষ ও ফিরিশতারা দুর্গন্ধ সহ্য করেন না। শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই (রোজাদারদের মুখের) এ দুর্গন্ধ পছন্দনীয়। এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। অন্য প্রাণীদের কাছে এ দুর্গন্ধ কেমন তাও আমি জানিনা। কারণ আল্লাহ আমাকে অন্যান্য প্রাণীদের শ্রেণীভূক্ত না করে মানব শ্রেণীভূক্ত করেছেন। যদিও তিনি আমাকে মাঝে মাঝে ফিরিশতাদের পর্যায়ে উন্নীত করেন। এ বিষয়ে আল্লাহই বেশি জানেন।

তৃষ্ণা নিবারণের দরজা দিয়ে রোজাদারদের বেহেশতে প্রবেশ: শরীয়ত রোজার অর্থকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করেছে যার ওপর বর্ণনা করার কিছু নেই। এর কারণ হচ্ছে আল্লাহ রোজাকে এক বিশেষ দরজা (মর্যাদা) দান করেছেন এবং এ দরজার একটা স্বতন্ত্র নামকরণও করেছেন যার চাহিদাই হচ্ছে পরিপূর্ণতা অর্জন। এ দরজাকে বলা হয় তৃষ্ণার্তদের দরজা (রাইয়ান)। এ দরজা হল রোজাদারদের প্রবেশ পথ। তৃষ্ণার নিবারণ ঘটে পানের পূর্ণতায়। এ বারি যে একবার পান করবে তার আর পিপাসার চাহিদা থাকবেনা। একবার যে তা কবুল করে দ্বিতীয়বার তার পিপাসা হয়না।

মুসলিম শরীফে হযরত সহল বিন সা'দ এর বাচনিক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর একটি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বলেছেন: "বেহেশতের একটা দরজার নাম হচ্ছে রাইয়ান। পুনরুত্থান দিবসে রোজাদারগণ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। তারা ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবেনা। তাদের শেষ জন প্রবেশ করার পর তা বন্ধ করে দেয়া হবে। আর কেউ তা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবেনা।"

রোজা ছাড়া অন্য কোন ইবাদতের জন্য এ রকম ঘোষণা দেয়া হয়নি। 'রাইয়ান' শব্দ দ্বারা তিনি রোজাদারদের অনন্য পুরষ্কারের কথা বলেছেন। এতে তাদের আমলের পরিপূর্ণতার কথা বলা হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে এ আমলের সাথে অন্য আমলের কোন তুলনা নেই। বস্তুত পক্ষে যার কোন সাদৃশ্য নেই সে-ই পরিপূর্ণ।

কুরআন হাদীসের আলোকে লাইলাতুল বারাআত

● মহিউদ্দিন মোহাম্মদ জোবায়ের ●

চান্দ্রবর্ষের অষ্টম মাস হলো শা'বান। এ মাসটি সম্মানিত ও বরকতময়। এ মাসই মহাসম্মানিত রমযান মাসের আগমনের খোশবার্তা বিশ্বের মুসলমানদেরকে দিয়ে যায়, যাতে তারা রমযান মুবারকের জন্য প্রস্তুত হতে পারে এবং তার অফুরন্ত কল্যাণ অর্জন করতে সক্ষম হয়। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন রমযান মাস শুরু হলে হাবীবে খোদা (দঃ) নিম্নের দোয়াটি পাঠ করতেন।

" আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজবি ওয়া শা'বান ওয়া বাল্লিগনা রামাদ্বান" হে আল্লাহ! আমাদের জন্য রজব ও শা'বান মাসে বরকত দান করুন এবং আমাদেরকে রমযান মাস পর্যন্ত পৌঁছে দিন।[১]

শা'বান মাসের ১৫ তারিখের রাত হলো লাইলাতুল বারাআত বা ক্ষমার রাত। একে ভাগ্য রজনী বলেও আখ্যায়িত করা হয়। এ রাতের ইবাদত মূলতঃ রমযান শরীফের মহান কদরের রাতের ইবাদতের ভূমিকা স্বরূপ। এ রাতে নফল নামায, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির-আযকার, দান খায়রাত ইত্যাদির দ্বারা আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা কর্তব্য। যাতে তিনি আমাদেরকে ক্ষমা করেন এবং আমাদের বিপদ আপদ ও বালা-মুসিবত দূর করে দেন।[২]

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে এক শ্রেণীর মুসলমান নামধারী ব্যক্তি বিশেষ এই পবিত্র রজনীর অস্তিত্ব আছে বলে স্বীকার করতে রাজী নয়। এই শ্রেণীর লোক সকল এও বলে বেড়ায় যে, প্রিয় নবী (দঃ) থেকে এ রাতের ইবাদত ও ফজিলতের কোন বর্ণনা নেই। কাজেই আমাদেরকে এ রাতের ফজিলত ও আমল সম্পর্কে প্রথমে লক্ষ্য করতে হবে প্রিয়নবী (দঃ) এ রাতে কী আমল করেছিলেন এবং উম্মাতের জন্য কোন উপদেশ দিয়েছিলেন। কালামে পাকে ইরশাদ হচ্ছে, "রাসূল যা কিছু দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে বিরত থাকতে বলেন তা থেকে বিরত থাক।[৩]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে, "আর রাসূল মনের প্রবৃত্তি থেকে কিছু বলেন না, এটা কেবল ওহী যা তাঁর কাছে করা হয়।[৪]

উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "এক রজনীতে আমি নবী (দঃ) কে বিছানায় পেলাম না। তাই আমি তাঁর সন্ধানে বের হলাম অতঃপর আমি বাকী নামক কবরস্থানে তাঁকে আকাশের দিকে মাথা উঠানো অবস্থায় দেখতে পেলাম। তখন তিনি বললেন,

"হে আয়েশা! তুমি কি এ ধারণা করেছো যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল তোমার উপর যুলুম করেছেন?" আয়েশা (রাঃ) বলেন, "আমি বললাম আমি তদ্রুপ ধারণা করিনি, তবে আমি ভেবেছিলাম আপনি আপনার অপর কোন স্ত্রীর কাছে গেছেন।" তখন প্রিয়নবী (দঃ) বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ জাল্লাশানুহু শা'বান মাসের ১৫ তারিখের রজনীতে প্রথম আকাশে অবতীর্ণ হন অতঃপর তিনি কালব গোত্রের বকরি গুলোর পশমের চেয়েও বেশী লোকের পাপ মার্জনা করেন"।[৫]

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রঃ) বলেন, "নবী করিম (দঃ) বাকী নামক কবরস্থানে সিজদারত ছিলেন এবং দীর্ঘক্ষণ সিজদায় কাটান আমি ধারণা করলাম হয়ত তাঁর হুঁশ চলে গেছে। এরপর তিনি সালাম ফিরিয়ে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করেন।[৬]

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (দঃ) আমার কাছে এসে তাঁর দুটি কাপড় খুলে রাখলেন এরপর তিনি না ঘুমিয়ে দণ্ডায়মান রইলেন। অতঃপর কাপড় দুটি পরিধান করলেন, আমি ধারণা করলাম হয়ত তিনি তাঁর অপর কোন স্ত্রীর কাছে যাবেন। এতে আমি খুব ঈর্ষান্বিত হলাম। তাই আমি তাঁকে অনুসরণ করার জন্য বের হলাম। অতঃপর আমি তাঁকে বাকিউল গারকাদ নামক কবরস্থানে পেলাম তিনি মু'মিন নারী পুরুষ ও শহীদানের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছেন"।[৭]

উপরে উল্লেখিত হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস তিনটি সামনে রাখলে আমাদের সামনে নবী করিম (দঃ) এর ঐ রাতের ইবাদত ও আমলের পূর্ণ চিত্র ভেসে উঠে যা তিনি মদীনার বাকী নামক কবরস্থানে করেছিলেন। আমলের চিত্রটি এই– তিনি এ রাতে বাকী নামক কবরস্থানে গিয়ে প্রথমে নফল নামাযে দাঁড়িয়ে একাগ্রচিত্তে সূরা কিরাত পাঠ করে খুব ধীরস্থিরভাবে রুকু করে সিজদায় গিয়ে খুব দেরী করলেন। এবং দীর্ঘ দোয়া পাঠ করে মৃত মু'মিন নর-নারী ও শহীদানের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। আর মৃত ব্যক্তিদের কথা স্মরণ করে এবং আকাশে আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল লক্ষ্য করে সাথে সাথে আল্লাহর ধ্যান ও জিকিরে রত হলেন।

দয়া ও রহমতের নবী (দঃ) এর আমল থেকে এ মাসআলা তিনটি বের হলঃ

১. যদি মুসলিমগণ এ রাতে একাগ্রচিত্তে নফল নামায পড়ে তবে তারা অসীম সওয়াবের অধিকারী হবে।

২. এ রাতে মুসলমানগণ কবরস্থানে গিয়ে মৃত মু'মিন

নর-নারী, পিতা-মাতা, আত্মীয় স্বজন ও শহীদানের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও দোয়া দরূদ পাঠ করতে পারে। আউলিয়ায়ে কামেলিনের মাজার জিয়ারত করে তথায় মোরাকাবা মোশাহেদায় রত হয়ে রূহানি ফয়েজ হাসিল করতে পারে।

৩. এ রাতে বাড়ীর নির্জন কক্ষে বা মসজিদে গিয়ে নফল নামায, যিকির আজকার কুরআন তিলাওয়াত, নবী (দঃ) এর শানে দরূদ সালাম পেশ করতে পারে। নিজের পাপরাশির কথা স্মরণ করে লজ্জিত হয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁর প্রিয় মাহবুবীনের ওসিলা নিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করবে যাতে তিনি তাঁদের ক্ষমা করে দিয়ে বিপদ আপদ ও বালা মুসিবত দূর করে দেন।

হযরত মওলা আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (দঃ) ইরশাদ করেছেন, "যখন শা'বান মাসের মধ্যবর্তী ১৫ তারিখের রাত উপস্থিত হয় তখন তোমরা সে রাতে আল্লাহর ইবাদতে দন্ডায়মান হও এবং দিনে রোযা রাখ। কারণ সে রাতে আল্লাহ তা'আলা সূর্যাস্তের সাথে সাথে প্রথম আকাশে অবতরণ করেন অতঃপর তিনি বলতে থাকেন কে আছ ক্ষমা প্রার্থী? আমি তাকে ক্ষমা করব। কে আছ রিযিক প্রার্থী? আমি তাকে রিযিক দান করব। কে আছ বিপদগ্রস্ত? আমি তাকে বিপদ মুক্ত করে দিব। প্রভাত হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এরূপ বলতে থাকেন।[৮]

হযরত মুআয ইবনে জবল (রাঃ) প্রিয় নবী (দঃ) এর সূত্রে বর্ণনা করেন, প্রিয় নবী (দঃ) ইরশাদ করেছেন, "শা'বান মাসের পনের তারিখের রাত্রে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত সমগ্র সৃষ্টি জগতের দিকে রহমতের দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করেন এবং সমগ্র জীবিত লোক সকলকে ক্ষমা করে দেন কিন্তু মুশরিক ও হিংসুক ব্যতিরেকে"।[৯]

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (দঃ) ইরশাদ করেছেন, "শা'বান মাসের মধ্যভাগের রজনীতে আল্লাহ জল্লাশানুহু উদ্ভাসিত হন এবং তাঁর সমস্ত বান্দাহকে ক্ষমা করেন, কিন্তু শিরককারী, হিংসুক ও আত্মহননকারী ব্যতিরেকে"।[১০]

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, "দোয়া কবুল হওয়ার জন্য পাঁচটি রাত আছে, সেগুলো হলো জুমুআর রাত, রজব মাসের প্রথমরাত, শা'বানের ১৫ তারিখের রাত, দুই ঈদের রাত"।[১১]

মহানবী (দঃ) এ রাতকে লাইলাতুল নিছফি মিন শা'বান বলেছেন, হাদীসের এই মূল কথাকে কেন্দ্র করে এ রাতের নাম "লাইলাতুল বারাআত" রাখা হয়েছে। এ প্রসংগে ইমাম কুরতুবী বলেন, শা'বান মাসের ১৫ তারিখের রাতের নাম রাখা হয়েছে "লাইলাতুল বারাআত"।[১২]

মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহ) লিখেছেন, "শা'বান মাসের ১৫ তারিখের রাত হলো লাইলাতুল বারাআত।[১৩]

ইরানে এ রাতের নাম শবে বারাআত রাখা হয়, ফার্সিতে 'শব' শব্দের অর্থ রাত।

ভারত বর্ষের আলেমগণ এ রাতের নাম "লাইলাতুল বারাআত" এবং "শবে বারাআত" উভয়টি গ্রহণ করেন।

ইন্দোনেশিয়ার জাভা প্রদেশের লোকেরা তাদের ভাষায় এ রাতকে 'রূহ-আহ' বলে। টিগ্রে সম্প্রদায় এ রাতকে মান্দাগেন এবং আচেমীয়গণ এ রাতকে কুন্দরীবু বলে। আলোচ্য দলিল প্রমাণের উপর নির্ভর করে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি লাইলাতুল বারাআতের অস্তিত্ব শতভাগ কুরআন হাদীস মুতাবেক। এ রাতের ফজিলত ও আমল সব কিছু প্রিয় নবী (দঃ) উম্মতকে শিখিয়ে গেছেন। এ রজনী শা'বান মাসের ১৫ তারিখের রজনী আর এটি হলো ভাগ্য রজনী, ক্ষমার রজনী। এ রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত, দোয়া, জিকির, ফিকির, মিলাদ মাহফিল, উত্তম কল্যাণকর উপদেশ ও নসিহতের আলোচনা করা উত্তম ইবাদত ও উত্তম কাজ।

তথ্যসূত্র:

১. বাইহাকী, মিশকাত শরীফ পৃঃ ১২১

২. মিরকাত, ৩ খণ্ড, পৃঃ ১৯৫

৩. আল কুরআন, সূরা আল হাশর, আয়াত ৭

৪. আল কুরআন, সূরা আন নাজম, আয়াত ৩-৪

৫. জামে আত্ তিরমিযী পৃঃ ১৫৬, লাইলাতুল নিসফি মিন শা'বান অধ্যায়, ইমাম আহমদ কৃত মুসনাদ খণ্ড-১৮ পৃঃ ১১৭, হাদীস নং ২৫৮৯, আবি বকর মুহাম্মদ ইবনে আবি শায়বা কৃত মুসান্নেফে আবি শায়বা খণ্ড-১ পৃঃ ৭৩৮ হাদীস নং ৯৯০৮, ইদারাতুল কুরআন করাচি কর্তৃক প্রকাশিত সুনানু ইবন মাজাহ পৃঃ ৯৯, ইমাম মুহিউস সুন্নাহ কাশী কৃত শরহে সুন্নাহ খণ্ড-৭ পৃঃ ১২৬, হাদীস নং ৯৯২, আততারগীব ওয়াততরহীব্ খণ্ড-৭ হাদীস নং ২৭

৬. মিরকাত ৩ খণ্ড, পৃঃ ১৮৯

৭. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী কৃত মা'সাবাত বিসসুন্নাহ ফি আইয়ামে সানাহ

৮. ইমাম ইবনে মাজাহ কৃত সুনানু ইবনে মাজাহ, পৃঃ ৯৯, বাইহাকী, শা'আবুল ঈমান ৩ খণ্ড পৃঃ ৩৭৯, মিশকাত পৃঃ ১১৫

৯. মজমাউজ্ জাওয়ায়েদ ৮ খণ্ড, পৃঃ ৬৫, আত তরগীব ওয়াত তরহীব, ২ খণ্ড, পৃঃ ২৮১, বাইহাকী শা'আবুল ঈমান ৩ খণ্ড, পৃঃ ৩৮২

১০. আততরগীব ওয়াত তরহীব ৭ খণ্ড, পৃঃ ২৩৯ হাদীস নং ২০, ইমাম আহমদ কৃত মুসনাদ ৬ খণ্ড, পৃঃ ১৯৮

১১. মুসান্নেফে আবদুর রাজ্জাক ৭ খণ্ড পৃঃ ৩১৭, বাইহাকী শা'আবুল ঈমান ২ খণ্ড, পৃঃ ১৩

১২. আল জামালি আহকামিল কুরআন, ৮ খণ্ড

১৩. মিরকাত ৩ খণ্ড, পৃঃ ১৯০

সূফী সাধক শেখ সাদী (রাহ্)

● অধ্যাপক মুহাম্মদ গোফরান ●

জন্ম ও বংশ পরিচয় : কামাল উদ্দিন ইব্নে ফুতি রচিত, " মাযানাউল আদাদ ফিমোজিমুল আল্ - ক্বাব" এ বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী সাদীর নাম মুসলেহ্ উদ্দীন আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ -বিন-মোশাররফ বিন্ -মুসলিম-বিন মুসরীফ। তবে তিনি সাদী সিরাজী নামে অধিক পরিচিত। তাঁর জন্ম তারিখ নিয়ে মত পার্থক্য রয়েছে। সাদী রচিত বুস্তান কাব্যগ্রন্থের মুখবন্ধ হতে আমরা নিশ্চিত ভাবে জানতে পারি যে তিনি ৬৫৫ হিঃ সনে, (১১৮৪ খ্রিঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। ফরাসী গবেষক হেনরী মেসীর গবেষণায় সাদীর উল্লিখিত জন্ম সনের সত্যতা মিলেছে। তিনি ইরানের সিরাজ শহরে জন্ম করেন যে শহরটি বহুকাল ইরানের রাজধানী ছিল।

সাদীর পিতার নাম ছিল আব্দুল্লাহ্ শাহ্। তিনি অত্যন্ত ধার্মিক ও খোদাভীরু লোক ছিলেন। তিনি ধর্মীয় অনুভূতি, কর্তব্যবোধ, নৈতিকতা, ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে সন্তানকে পরিপক্ষ করে তোলেন। শেখ সাদী ধর্মীয় কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন এবং পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও নামাজের মাধ্যমে সারারাত জেগে কাটাতেন।

শৈশব: গুলিস্তা কাব্যে শেখ সাদী তাঁর শৈশবের একটা ঘটনার কথা বর্ণনা করেন। একদা এক গভীর রজনীতে তিনি ও তাঁর পিতাসহ আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন ছিলেন। কয়েকজন লোক তাদের পাশে ঘুমিয়ে পড়লেন। পিতাকে তাঁর ধ্যানমগ্নতা হতে বিচ্যুৎ করে সাদী বললেন, "দেখুন তারা অচেতনভাবে ঘুমিয়ে পড়েছে। দু'রাকয়াত নামাজ আদায় করার মত সময় তাদের কপালে জুটল না"। সাদীর একথা শুনে তাঁর পিতা জবাব দিলেন, "অন্যের দোষত্রুটির সন্ধান করার চেয়ে তুমিও ঘুমিয়ে পড়লে অধিক ভাল হত।" শৈশবে হতে তিনি পিতার সান্নিধ্যে থেকে ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন।

ফকীহ: তৎকালীন রাজা সাদজঙ্গীর নামানুসারে তার নাম সাদী হিসেবে পরিচিতি ও স্বীকৃতি লাভ করে। তাঁর জীবনের একেবারে শুরু থেকেই ইসলামী জ্ঞান তথা ফিকাহ্ শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি অর্জন করায় তাঁকে ফকীহ্ উপাধীতে ভূষিত করা হয়। তিনি বাইলবিখা মসজিদের মিনারে দাঁড়িয়ে হাদিস, ফিক্হ, ইরফানিয়ত ও হাক্বিকত প্রচার করতেন। তিনি ইসলামী জ্ঞানের এত সুউচ্চ অবস্থানে উপনীত হয়েছিলেন যে মাত্র ২৬ বছর বয়সে তাঁর খ্যাতি সারা বিশ্বে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

বাগদাদ গমন: পিতার মৃত্যুর পর তাঁর জীবনে সুখশান্তি বিঘ্নিত হয়। সামাজিক বিশৃঙ্খলা এবং রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার কারণে সিরাজ শহরটি তাঁর নিকট এক প্রকার অসহনীয় হয়ে উঠে। তাই সাদ-বিন-জঙ্গী উচ্চ শিক্ষার জন্য তাঁকে বাগদাদের নিজামীয়া মাদ্রাসায় প্রেরণ করেন যে মাদ্রাসাটি ৪৫৭ হিঃ সনে খাজা নিজামুল মুল্খ তুসী প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলিম বিশ্বে এ মাদ্রাসাটি ছিল সবচেয়ে বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। হাজার হাজার প্রসিদ্ধ উলামায়ে কেরাম এ মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করে সারা বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছে। শেখ সাদী এ মাদ্রাসায় অধ্যয়নের জন্য তাঁর জীবনের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন।

বিশিষ্ট আলেমে দীন ইমাম উল মুল্ক আল্লামা আবুল ফয়জ আব্দুর রহমান ইব্নে যাওজী (রাহ্) ছিলেন শেখ সাদীর অন্যতম শিক্ষক। হাদীস এবং তাফসীরে ইমাম যাওজী (রাহ্) এর মত সুদক্ষ আলিম আজ পর্যন্ত বিরল। শেখ সাদী তাঁর লেখনীর জন্য যতটা পরিচিত না তার চেয়ে বেশী পরিচিতি ইমাম যাওজী (রাহ্) এর ছাত্র হিসেবে। ইমাম যওজী (রাহ্) হাদীস সম্পর্কে যতটুকু সতর্ক ছিলেন শেখ সাদী অবশ্য অত সতর্ক ছিলেন না।

শৈশব হতেই সাদী খুবই বুদ্ধিমান ছিলেন। তাঁর বাকপটুতা সবাইকে আকৃষ্ট করত। তাঁর অসাধারণ বক্তৃতা ও সুন্দর বাচন ভঙ্গীর জন্য সমসাময়িক অনেক শিক্ষার্থী ও সহপাঠি তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেন। একদা সাদী তাঁর এক বন্ধুর হিংসা বিদ্বেষের কথা উল্লেখ করে ওস্তাদের নিকট অভিযোগ করলেন। ওস্তাদ তাঁর অভিযোগ শুনে বললেন," যে ছেলেটি তোমার প্রতি হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করছে তাঁর জীবন ধ্বংসের পথে ধাবিত হচ্ছে আর তুমি তাঁর অনুপস্থিতে তাকে দোষারোপ করায় (গীবত) তুমি ধ্বংসাভিমুখে অগ্রসর হচ্ছ।"

আধ্যাত্মিক শিক্ষা: সূফিবাদের উপর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "আওয়ারিফুল মা'রীফ" এর প্রণেতা হযরত শেখ শিহাবউদ্দিন সোহরাওয়ার্দী এর নিকট হতে সাদী আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণ করে ধন্য হন। তাঁর সান্নিধ্যে থেকে সাদী ইল্ম শিক্ষায় পূর্ণতা লাভ করেন। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, তিনি মাওলানা রুমীর সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তাঁর সাথে আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে কথোপকথন হয়েছে বলে জানা যায়।

ইতিহাস রচয়িতাগণ সাদীর জীবনকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করেন। প্রথম ৩০ বছর শিক্ষাজীবন, তারপরের ৩০ বছর ভ্রমণ ও কাব্যচর্চা পরবর্তী ৩০ বছর ধ্যানমগ্নতা এবং অবশিষ্ট ১২ বছর সূফিবাদ চর্চার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেন।

দেশভ্রমণঃ শিক্ষা জীবন শেষ করে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি যখন ভ্রমণে বের হতেন তাঁর পকেটে এক কানাকড়িও থাকত না ফলে তাঁকে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হত। তিনি ইবনে বতুতার মত বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। তুরস্ক, বলখ, গজনী, সিরিয়া, মিশর, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ, এশিয়ার বিভিন্ন এলাকা, পাঞ্জাব ও গুজরাট ভ্রমণ করেন। ভ্রমণ কালে তিনি বিভিন্ন শ্রেণি, গোষ্ঠি, জাতি ও বিভিন্ন ধর্মের লোকের সাথে মিলিত হয়ে তাদের কৃষ্টি, সাহিত্য ও সভ্যতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেন।

একদা তিনি দামেস্কের অধিবাসীদের প্রতি বিরক্ত হয়ে এলাকা ত্যাগ করে ত্রিপোলির কাছাকাছি এক জঙ্গলে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। সেখানে গিয়ে তিনি খ্রীস্টান সেনাদের হাতে বন্দী হন। সৈন্যদল তাঁকে ইহুদী বন্দীদের সাথে খনন কাজে নিয়োজিত করলেন। শেখ সাদী বাধ্য হয়ে বন্দী জীবন অতিবাহিত করতে লাগলেন। সাদীর পূর্বপরিচিত আলেপ্পোর এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সাদীকে বন্দী অবস্থায় দেখে সে খ্রীস্টান বন্দিশালা থেকে দশ দিনারের বিনিময়ে মুক্ত করে তার ঘরে নিয়ে যান। ঐ ব্যক্তির ঘরে তার এক কন্যা ছিল যাকে তিনি শেখ শাদীর সাথে একশ দিনার দেনমোহরে বিয়ে দেন। সাদীর ঐ স্ত্রী ছিল অত্যন্ত বদমেজাজী মহিলা। প্রায়শঃ তিনি সাদীর সাথে দুর্ব্যবহার করতেন। একদিন এমনও বলে ফেলেছেন, "আপনাকে আমার পিতা দশ দিনারের বিনিময়ে বন্দিশালা হতে মুক্ত করে এনেছেন" স্ত্রীর এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্যের জবাবে সাদী বললেন, "হ্যাঁ আমি সে ব্যক্তি যার নিকট তোমার পিতা তোমাকে ১০০ দিনারের বিনিময়ে বিক্রী করেছেন।"

ঐ স্ত্রীর সংসারে সাদীর এক ছেলে সন্তান ছিল যেটা পরবর্তীতে মারা যান। দাম্পত্য জীবনের এ ব্যথা তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মনে বিঁধেছিল। এক পর্যায়ে অবশ্য তাঁরা একে অপর হতে আইনসিদ্ধভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। শেখ সাদী হিন্দু বেশে গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন বলে জানা যায়। তিনি কমপক্ষে চৌদ্দবার হজ্বব্রত পালন করেন।

বহুকাল পর শেখ সাদী সিরাজে প্রত্যাবর্তন করেন। তখন সিরাজের শাসক ছিলেন আবু বকর সাদী বিন জঙ্গী যিনি ঐ শহরের শান্তি শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। কিন্তু আবু বকর জঙ্গী দেশে উলামা ও বিজ্ঞজনদের সহ্য করতে পারতেন না। তাই শেখ সাদী বাধ্য হয়ে সাধারণ মানুষের মত ছদ্মবেশে দেশবাসীকে উপদেশ দিতে শুরু করেন। ঐ সময়ে অর্থাৎ ৬৫৫ হিঃ সনে তিনি বুস্তান এবং ৫৬৫ হিঃ সনে গুলিস্তান রচনা করেন। সিরাজ শহর যখন এলখানী শাসকের অধীনে চলে আসে তখনও সাদী কোন প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হননি। ৬২৩-৬৬২ হিঃ সন পর্যন্ত সাদ বিন জঙ্গীর শাসনামলের পর হালাকু খান ক্ষমতায় আসেন। হালাকুখানের শাসনামলের রক্তাক্ত বাগদাদের প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন শেখ সাদী।

খাজা শামসুদ্দীন এবং খাজা আলাউদ্দিন শেখ সাদীর অকৃত্রিম অনুসারী ছিল। ঐ দু'ভায়ের সাথে সাক্ষাতের জন্য একদা হজ্বব্রত পালন শেষে শেখ সাদী তাবরীজ যাওয়ার মনস্থ করলেন। ঘোড়ায় আরোহন করে চলার পথে হঠাৎ করে দুই ভাই দেখতে পেলেন যে শেখ সাদী আসছেন। তারা তাড়াতাড়ি ঘোড়া হতে নেমে তাকে কদমবুচি করলেন এবং অত্যন্ত বিনয়ের সাথে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন।

এ দৃশ্য দেখে সুলতান আবাকা খান অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন উনি কে? আপনারা এভাবে সম্মান দেখালেন? দু' ভাই উত্তর দিলেন, "তিনি আমাদের শায়খ শেখ সাদী"। সুলতান বললেন, "আমাকে তাঁর সাথে একবার সাক্ষাৎ করিয়ে দিন।" সুলতান কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে দু'ভাই শেখ সাদীর নিকট গিয়ে সুলতানের অভিপ্রায়ের কথা জানালেন। সাদী সুলতানের সাথে সাক্ষাৎ করতে রাজী হলেন। দিন ক্ষণ ঠিক করে শেখ সাদী সুলতানের প্রাসাদে গমণ করলেন তাঁকে একটি উচ্চ মর্যদার আসনে বসতে দেয়া হল। অল্পক্ষণ আলাপচারিতা শেষে যখন শেখ সাদী বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, সুলতান তাকে বললেন, "আপনি আমাকে কোন উপদেশ দিয়ে ধন্য করবেন না?"

শেখ সাদী কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন অতপর বললেন "সৎ কাজ, পাপ ও পূণ্য ছাড়া মৃত্যুর পর আপনার সাথে কিছুই যাবে না। এখন আপনি এ দু' টো থেকে একটি বেছে নিন।" একথা শুনে সুলতান তার চক্ষু জল সংবরণ করতে পারলেন না।

রচনাবলীঃ শেখ সাদী প্রবন্ধ ও কাব্য রচনার মাধ্যমে ফার্সী ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর গদ্য ও পদ্য মিলে প্রায় ২০ টি গ্রন্থ রয়েছে। তিনি মসনবী ও কৃসীদার চেয়ে গজলের

জন্য অধিক জনপ্রিয়। তাই তাকে গজলের প্রবক্তা বলা হয়।

সুখানী সমরখন্দীর মত শেখ সাদী হিযালিয়াত রচনা করেন। তাঁর অধিকাংশ কবিতা নৈতিকতা সংক্রান্ত। আমরা যদি তাঁর কবিতা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাই যে তিনি একজন ইসলামীক কবি ছিলেন। প্রথম 'রাসালাত -ই-সফিনা' পবিত্র কুরআনের সুরা 'কাহাফ' অনুসারে রচিত হয়েছে।

সা'দীর নৈতিকতা সম্পর্কীয় গ্রন্থগুলো নতুন কিছু নয়। তাঁর 'গুলিস্তান' এবং 'বুস্তান' গরীব, ধনী, ভিক্ষুক, রাজা, ফকির, দরবেশ, নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষের জন্য রচিত হয়েছে। শেখ সাদী তাঁর কাব্যে মানবতার এবং প্রেমবাদের পাশাপাশি 'তাসাওউফ' বা সুফিবাদের গভীর চর্চা করেছেন। তাসাওউফ চর্চার মধ্য দিয়ে তিনি নৈতিকতা ও আদর্শ মানবের গুণাবলী অত্যন্ত সুনিপুণ ভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর বুস্তান, গুলিস্তান এবং পন্দনামা পাঠ করলে মানব মনে এক অনন্য অনুভূতি জাগ্রত হয়।

শেখ সাদী একজন আশিকে রাসূল ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর শানে রচিত পংক্তিমালা আজও মুসলিম সমাজে সর্বস্তরের মানুষের মুখে শোনা যায়।

বালাগাল উলা বিকামালিহি, কাশাফাদ্দুজা বিজামালিহি
হাসানাত জামিউ কিছালিহি, ছল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি।

শেখ সাদী সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে একজন ফার্সী কবি বলেন, "নবুয়ত শেষ হয়ে গেল কিন্তু দুনিয়ায় কবিতার জগতের তিনজন প্রবক্তা রয়ে গেছেন আর তাঁরা হলেন, মহাকাব্য রচনায় ফেরদৌসি, ক্বসীদা রচনায় আনোয়ারী এবং গীতি কবিতা ও গজল রচনায় শেখ সাদী।

শেখ সাদী ৬৫৫ হিঃ সন মোতাবেক ১২৫৭ খ্রীষ্টাব্দে 'বুস্তান' রচনা করেন এবং এক বছর পর 'গুলিস্তান' রচনা করেন। এ দুটি গ্রন্থ বিশ্বসাহিত্য অঙ্গনে অনবদ্য সৃষ্টি বলে বিবেচিত। 'বুস্তান' হচ্ছে নৈতিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় মহাকাব্য আর গুলিস্তান গদ্যাকারে লিখিত। এ গ্রন্থে তিনি ছোট গল্পাকারে নৈতিক শিক্ষার বিষয়ে বিশেষ জোর দিয়েছেন। কোন বিষয় বর্ণনা করার সময় তিনি আলোচনার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে যখন তখন কবিতা রচনা করতেন। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি তাঁর লেখনিকে আরো শক্তিশালী করেছে। তাঁর এ গ্রন্থ দু'টি 'সাদীনামা' বলে পরিচিত। এ গ্রন্থদ্বয়ে শেখ সাদীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রতিফলন লক্ষণীয়। তিনি কখনো সরাসরি কাউকে উপদেশ কিংবা নৈতিক শিক্ষা দেননি। তিনি ছোটখাট সুন্দর গল্পের অবতারণা করে উদাহরণের মাধ্যমে মানুষকে নৈতিক শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করতেন যে কারণে তাঁর বুস্তান, গুলিস্তান ও পান্দনামা পাঠ করে কেউ বিরক্ত বোধ করেন না বরং আনন্দ উপভোগ করেন।

প্রভাবঃ হাফিজ সিরাজী বলেন, "শেখ সাদী গজলের সবচেয়ে বড় ওস্তাদ"। সাদীর 'পান্দনামা' বা করিমা ফরিদ উদ্দিন আত্তারের লেখার অনুরূপ তাঁর রচিত মসনবী, আরবি এবং ফার্সী ভাষায় লিখিত দিওয়ান, নৈতিকতা বিষয়ে ক্বসীদা আরবী এবং ফার্সী ভাষার সংমিশ্রনে লিখিত মর্সিয়া উল্লেখযোগ্য। তাঁর তায়্যিবাত, বাদায়ী এবং খাওয়াতীম, ছাড়াও রয়েছে মুহিব নামা, মুতাকাত, মুবীক্বাত, রুবাইয়্যাত এবং মুফতারাত। তিনি হাযালিয়াত এবং খবিসা রচনা করেছেন। খাওয়াতিম সম্ভবত তাঁর রচিত গজল সমগ্রের মধ্যে খুবই প্রসিদ্ধ। সাদীর গুলিস্তান, উর্দু, আরবী, তুর্কি এবং বাংলায় অনুদিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় সাদীর বুস্তান এবং গুলিস্তা অনুবাদ করেছেন এ.বি.এম আব্দুল মান্নান। কাজী আকবর হোসেন অনুবাদ করেছেন করিমা । (ইতিক্বাদ বুক ডিপো, কলকাতা)

শেষ জীবনঃ সাদী তাঁর জীবন সায়াহ্নে এসে সিরাজ হতে আধামাইল দূরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বড় বড় আলিম, ফাজিলগণ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে সেখানে আসতেন। সেই আশ্রয় স্থলেই তিনি ৬৯১ হিঃ সনের ২ জিলক্বদ/১২৯২ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে ইন্তিকাল করেন। ১৩০০ খ্রীঃ এর শেষের দিকে মুলতানের শাসক প্রিন্স মুহাম্মদ খান শহীদ তাঁর পিতা গিয়াস উদ্দিন বলবন এর পক্ষে ভারতে দুইবার শেখ সাদীকে আমন্ত্রণ জানান। সাদী তাঁর বার্ধক্য জনিত কারণে দাওয়াত গ্রহণ করতে না পারলেও উপহার স্বরূপ প্রিন্সের কাছে তাঁর হস্তলিখিত 'গুলিস্তান' এবং 'বুস্তান' প্রেরণ করেন। যে স্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয় সেটা সাদীয়া নামে পরিচিত। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শেখ সাদীর মাজার দর্শনে গেছেন বলে জানা যায়।

তথ্য সূত্র :

ক) তারিখ-ই-ইরান-ড. রিদাযাদেহ সাফাখ।
খ) ইরানী কবি মুহাম্মদ মনসুর উদ্দিন।
গ) A literary history of Persia
E.G. Brown

প্রাচীন কাল থেকে বিরচিত তাসাউফ বিষয়ক কতিপয় গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

●আলহাজ্ব মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী●

মুখবন্ধ: নাহমাদুহু ওয়া নুছাল্লি আলা হাবিবিহিল করিম। পবিত্র ইসলাম ধর্মে ধর্মীয় বিধি-বিধান, অনুশাসন, শরীয়ত জীবন-বিধানের পাশাপাশি তাসাউফ বা মরমীবাদ, সূফি দর্শন অথবা আত্মশুদ্ধি পদ্ধতি বিষয়টিও অপরিহার্য একটি বিষয় যা ধর্মের অঙ্গীভূত।

কোন কোন ধর্ম বিশারদের মতে এটি আবশ্যকীয় ভাবে ধর্মের অন্তরভুক্ত, কেননা এ বিষয়টি কুরআনুল করীমে এবং হাদীসে পাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিবৃত রয়েছে।

এ বিষয়টি নিয়ে গবেষকবৃন্দের গবেষণালব্ধ সংজ্ঞা হলো, কাম-ক্রোধ রিপুনিচয়ের অন্যায় আকাঙ্ক্ষা হতে পবিত্র হওয়া ও সে সম্পর্কে সূক্ষ্ম জ্ঞান অর্জন, অধিকন্তু সূফিগণের আচরিত ধর্মীয় মতবাদই হলো সুফিতত্ত্ব যা ইসলামী পরিভাষায় তাসাউফ নামে অভিহিত।

যারা তাসাউফ মানেনা, বুঝেনা তারা ধর্মের একাংশকে মানেনা বা বুঝেনা। তাসাউফ হলো ধর্মের পূর্ণাঙ্গতা বিধান ও সাধনকারী একটি বিষয়। কোন মুসলমান এটিকে অবহেলা বা অবজ্ঞা করতে পারে না।

এ বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থাদি রচনার সূত্রপাত ঘটে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দিতে। প্রথমে আরবী ভাষায়, পরবর্তীতে ফার্সী ভাষায়, আরো পরে উর্দূ ভাষায় তাসাউফ ভিত্তিক গ্রন্থ ও কিতাবাদি প্রণয়ণ করা হয়। বর্তমান সময়ে বাংলা ভাষাসহ বিশ্বের অনেক ভাষায় তাসাউফ গ্রন্থ রচিত হয়ে সমগ্র বিশ্বে তাসাউফ জ্ঞান ছড়িয়ে পড়েছে। তবে প্রাথমিক যুগে যে কিতাবগুলো রচিত হয়েছিল তার অনেক গুলো বর্তমানে দুস্প্রাপ্য। সর্ব সাধারণের জ্ঞাতার্থে ক্রম ধারা অনুযায়ী কতিপয় গ্রন্থের নাম, রচনাকারী, রচনা কাল, ভাষা ইত্যাদি তথ্যসহ এতদসঙ্গে উপস্থাপনের প্রয়াস নিলাম।

আরবী ভাষায় (১) আল মুরিদীন, শেখ ইয়াহইয়া ইবনে মায়াজ রাজী (রাহঃ) ইন্তিকাল ১২০ হিঃ (২) কিয়ামুল্লাইল ওয়াত্ তাহাজ্জুদ, শেখ ওমর বিন মুহাম্মদ বিন আবদুল হাকীম প্রকাশ আবু হাফ্স (রাহঃ) ইন্তিকাল ১২০ হিঃ (৩) আত্ তাফাক্কুর ওয়াল এতেবার, শেখ হারেছ বিন আসাদ প্রকাশ মাহাছেবী বাগদাদী (রাহঃ) ইন্তিকাল ২৭৩ হিঃ (৪) আল মজালেছ, আবুছ ছিররী মনসুর বিন আম্মার (রাহঃ) ইন্তিকাল ২৭৩ হিঃ (৫) আর রেয়াএআত্ লে হুকুকিল্লাহ ও (৬) আত্ তওয়াহ্হুম, শেখ হারেছ মাহাছেবী বাগদাদী (রাহঃ) ইন্তিকাল ২৭৩ হিঃ (৭) মাক্বায়েদুশ শাইতান, (৮) কিতাব আল আখলাক্ব, (৯) কিতাব আত্ তক্বওয়া ও (১০) আল মকারেমুল আখলাক্ব, শেখ ওবাইদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ প্রকাশ আবিদুনিয়া (রাহঃ) ইন্তিকাল ২৮০ হিঃ (১১) আল মুতমাইন মিনাস্ সিয়াহ ওয়াল ইবাদ আল মুতাসাওএফীন, শেখ আবু হামজা সুফি (রাহঃ) ইন্তিকাল ২৮৯ হিঃ (১২) কিতাব আত তওয়াক্কুল, শেখ মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া প্রকাশ হিসামুল কারী (রাহঃ) ইন্তিকাল ২৯২ হিঃ (১৩) আমছালুল কুরআন ও (১৪) আর রছায়েল, শায়খুল মশায়েখ হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রাহঃ) ইন্তিকাল ২৯৭ হিঃ (১৫) কিতাবুল খাউফ, (১৬) কিতাবুল ওরায়, (১৭) কিতাবুর রোহবান ও (১৮) কিতাবুল মুহাব্বত, শেখ ইবনুল জুনাইদ বাগদাদী (রাহঃ) ইন্তিকাল ২৯৭ হিঃ (১৯) আস সুহবাত্, (২০) আল মুতমাইন, (২১) জুদ ওয়াল করম, (২২) কিতাব আল হুম্মা, (২৩) আল বছর ও (২৪) আত্ ত্বোয়াত, শেখ আবু জাফর মুহাম্মদ বিন হোসাইন বরজুলানী (রাহঃ) ইন্তিকাল ৩০০ হিঃ (২৫) তাসীনুল আজল, (২৬) ইলমুল বাক্বা ওয়াল ফানা, (২৭) কিতাব আল ইয়াক্বীন ও (২৮) কিতাব আত তওহীদ, শেখ হুসাইন বিন মনসুর হাল্লাজ (রাহঃ) ইন্তিকাল ৩০৯ হিঃ (২৯) কিতাব আল কবির, শেখ আবুল হাসান আলী ইবনে আহমদ মিশরী (রাহঃ) ইন্তিকাল ৩২৮ হিঃ (৩০) কিতাব আল ফিহরিস্ত, শেখ ইবনে নদীম (রাহঃ) ইন্তিকাল ৩৭৫ হিঃ (৩১) কাশফুজ জনুন, আল্লামা হাদী খলীফা (রাহঃ) ইন্তিকাল ৩৭৫ হিঃ (৩২) কিতাব আল্ লামায়ে, শেখ আবু নসর আবদুল্লাহ ইবনে আলী ছাররাজ তুছী (রাহঃ) ইন্তিকাল ৩৭৮ হিঃ (৩৩) কিতাবুত্ তায়াররুফ, শেখ আবু বকর মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম বুখারী (রাহঃ) ইন্তিকাল ৩৮০ হিঃ (৩৪) দক্বায়েকুল মুহিববিন ও (৩৫) মওয়ায়েজুল আরেফীন শেখ সাহাল বিন আবদুল্লাহ তছতরী (রাহঃ) ইন্তিকাল ৩৮৩ হিঃ (৩৬) কুয়াতুল কুলুব ফী মুয়ামিলাতিল মাহবুব, শেখুশ শুয়ুখ আবুতালেব প্রকাশ মুহাম্মদ বিন আলী আতীয়া হারেসী আল মক্কী (রাহঃ) ইন্তিকাল ৩৮৬ হিঃ (৩৭) তবকাতুস সুফিয়্যাহ, শেখ আবু আবদুর রহমান মুহাম্মদ বিন আল হোসাইন নিশাপুরী (রাহঃ) ইন্তিকাল ৪১২ হিঃ (৩৮) হিলয়াতুল আউলিয়া ও তবকাতুল আসফিয়া, মুহাদ্দিস ও শাইখুল মশায়েখ আবুন নঈম বিন আবদুল্লাহ (রাহঃ) ইন্তিকাল ৪৩০ হিঃ (৩৯) রিসালা কুশাইরিয়া, শেখ আবুল কাশেম আবদুল করিম বিন হুয়াজেন কুশাইরী নিশাপুরী

(রাহঃ) ইন্তিকাল ৪৬৫ হিঃ (৪০) মনাজেলুছ ছায়েরীন, খাজা আবদুল্লাহ আনসারী হারজী (রাহঃ) ইন্তিকাল ৪৮১ হিঃ (৪১) এহইয়াউল উলুম, (৪২) আইনুল ইলম, হুজ্জাতুল ইসলাম হামেদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী (রাহঃ) ইন্তিকাল ৫০৫ হিঃ (৪৩) সফওয়াতুশ সাফওয়া, ইমাম আবুল ফরাহ আবদুর রহমান ইবুনল জাওজী (রাহঃ) ইন্তিকাল ৫০৫ হিঃ (৪৪) আজ্ জখীরাহ ফিল এলমুল বসীরাহ, (৪৫) লুবাব এহইয়াউল উলুম, (৪৬) তলখিস এহইয়াউল উলুম, (৪৭) হুওয়ানেহ আল উশ্শাক্ব, (৪৮) তাজিয়ানা ছলুক, ও (৪৯) মকতুবাতে শেখ আহমদ গাজ্জালী, শেখ আহমদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী (রাহঃ) (ভ্রাতা ইমাম গাজ্জালী) ইন্তিকাল ৫২০ হিঃ (৫০) জুবদাতুল হাক্বায়েক্ব, শেখ আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আবুল ফসায়েল মকতুল প্রকাশ আইনুল কুদাত হামদানী (রাহঃ) ইন্তিকাল ৫২৫ হিঃ (৫১) আসরারুত তওহীদ, (৫২) মকামাত শেখ আবু সাঈদ (রাহঃ) ইন্তিকাল ৫৫৮ হিঃ (৫৩) ফতহুল গায়ব, (৫৪) গুনিয়াতুত্ তালেবীন, (৫৫) আল ফতহুর রব্বানী, শেখুল মশায়েখ শেখ আবদুল কাদের জিলানী প্রকাশ গাউসুল আযম (কঃ) ইন্তিকাল ৫৬১ হিঃ (৫৬) কিতাবুল আনোয়ার কী কাশফিল আছরার, শেখুহ্ তায়েফা রোজ বাহান বাক্বীলী (রাহঃ) ইন্তিকাল ৬০৬ হিঃ (৫৭) জুবদাতুল হাক্বায়েক্ব, শেখ আজিজ বিন নাছাফী (রাহঃ) ইন্তিকাল ৬১৮ হিঃ (৫৮) মক্বসদুল আকসা, শেখ ফরিদ উদ্দীন আত্তার শহীদ (রাহঃ) ইন্তিকাল ৬২০ হিঃ (৫৯) আওয়ারেফুল মায়ারেফ, (৬০) রিশফুন্ নাসাইহ, (৬১) জজবুল কুলুব ইলা মওছিলাত্তিল মাহবুব, শেখুশ শুয়ুখ শিহাব উদ্দীন ওমর বিন মুহাম্মদ সহরওয়ার্দী (রাহঃ) ইন্তিকাল ৬৩২ হিঃ (৬২) মওয়াকেউন নজুম, (৬৩) নক্বশুল নসুস, (৬৪) ফতুহাতে মক্কীয়াহ, (৬৫) ফসুসুল হিকাম, শেখ মহীউদ্দীন ইবুনল আরবী আনদুলুছী প্রকাশ শেখ আকবর (রাহঃ) ইন্তিকাল ৬৩৮ হিঃ (৬৬) উলুমুল হক্বায়েক হিকমুদ্ দক্বায়েক, শেখ ছায়াদ উদ্দীন হমুবী (রাহঃ) ইন্তিকাল ৬৫০ হিঃ (৬৭) মিফতাহুল গাইব, (৬৯) নসুস, (৭০) ফকুক, শেখ সদর উদ্দীন মুহাম্মদ বিন ইসহাক কুনুবী (রাহঃ) ইন্তিকাল ৬৭৩ হিঃ (৭১) নক্বদুন্ নসুস, (৭২) লওয়ামেহ্, শেখ মাওলানা নুরুদ্দীন বিন জামী (রাহঃ) ইন্তিকাল ৮৯৮ হিঃ

ফার্সী ভাষায়ঃ (৭৩) কাশফুল মাহজুব, শেখ আবুল হাসান আলী হেজবিরী প্রকাশ দাতা গঞ্জ বখশ লাহোরী (রাহঃ) ইন্তিকাল ৪৭০ হিঃ (৭৪) তবকাতুস সুফিয়্যাহ, শেখ আবু ইসমাঈল আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আনসারী হারবী (রাহঃ) ইন্তিকাল ৫৮১ হিঃ (৭৫) কিমিয়া এ সায়াদাত, হুজ্জাতুল ইসলাম আবু হামেদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী (রাহঃ) ইন্তিকাল ৫০৫ হিঃ (৭৬) তাজকেরাতুল আউলিয়া, শেখ ফরিদ উদ্দীন আত্তার (রাহঃ) ইন্তিকাল ৬২০ হিঃ (৭৭) মিরসাদুল ইবাদ মিনাল মুবদা ইলাল মায়াদ, শেখ নজমুদ্দীন রাজী প্রকাশ শেখ নজম উদ্দীন দাইয়া (রাহঃ) ইন্তিকাল ৬৬৪ হিঃ (৭৮) ফীহি মা ফীহি, (৭৯) মকতুবাতে রুমী, (৮০) মজালেছে ছবয়া রুমী, মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমী প্রকাশ আরেফ রুমী (রাহঃ) ইন্তিকাল ৬৭২ হিঃ, (৮১) লামেয়াত, শেখ ফখর উদ্দীন ইরাকী (রাহঃ) ইন্তিকাল ৬৮৮ হিঃ (৮২) মিসবাহুল হিদায়াত, শেখ ইজাজুদ্দিন মুহাম্মদ বিন আলী কাশানী (রাহঃ) ইন্তিকাল ৭৩৫ হিঃ (৮৩) নফহাতুল উন্সুহ, (৮৪) লওয়ায়েহ্, আশয়াতুল লামেয়াত, মাওলানা নুরুদ্দীন বিন জামী (রাহঃ) ইন্তিকাল ৮৯৮ হিঃ (৮৫) মজালেছুল ওশ্শাক্ব, আবুল গাজী সুলতান হোসাইন বিন মুররাহ ওয়ালী হিরাত (রাহঃ) ইন্তিকাল ৮৯৮ হিঃ (৮৬) আদাবুল মুরীদীন, শেখ আবদুল কাহের (রাহঃ) ইন্তিকাল ৮৯৮হিঃ ।

সূফি উক্তি

- কুস্বভাবাপন্ন আলেম অপেক্ষা সুস্বভাবাপন্ন ফাসেকের সাহচর্য উত্তম ।
- আল্লাহর নিয়ামত ও স্বীয় অপরাধের কথা চিন্তা করলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তা-ই লজ্জা ।
- স্বীয় ইখতিয়ারকে দূর করে আল্লাহর ইচ্ছার উপর নিজেকে সোপর্দ করার নাম রোজা ।
- তাওবার অবস্থা তিনটি । যথাঃ (১) আল্লাহর নিকট লজ্জিত হওয়া, (২) পাপ কাজ বর্জন করার দৃঢ় সঙ্কল্প করা, আর (৩) জুলুম ও ঝগড়া থেকে নিজেকে পাক রাখা ।
- সত্যবাদীর নাম হল সততা । যে ব্যক্তিকে কথায়, কাজে সৎ দেখা যায়, সে-ই সিদ্দীক ।

–হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রাহ.)

শরিয়ত ও মাইজভাণ্ডারী তরিকা

● সৈয়দ মুহাম্মদ ফখরুল আবেদীন রায়হান ●

আমাদের সাধারণ জ্ঞান অনুযায়ী, শরিয়ত অর্থ হল আল্লাহর হুকুম বা আদেশ। আল্লাহ তাঁর হাবীব হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে বান্দার জন্য যে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা-ই হল শরিয়ত। অর্থাৎ বান্দার পার্থিব, আত্মিক, আধ্যাত্মিক, যাবতীয় উন্নতিকল্পে যা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে বান্দার জন্য অবতীর্ণ, তাকেই আমরা দ্বীনে ইসলাম হিসেবে চিহ্নিত করি। যে প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, ইন্নাদ্দিনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম অর্থাৎ আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় দ্বীন হল ইসলাম। (সূরা আলে ইমরানঃ ১৯) এই দ্বীনে ইসলামই সর্বসম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য ধর্ম । দ্বীনে ইসলামের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হল শরিয়ত। আমি এ নিবন্ধে শরিয়ত সম্পর্কে কিঞ্চিত ব্যাখ্যা উপস্থাপনের প্রয়াস পাব, ইনশাআল্লাহ। খলিফায়ে গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী, মুজাদ্দিদে মিল্লাত মুফতীয়ে আ'যম গাউসে যমান আল্লামা শাহসূফি সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (কঃ) তাঁর 'তোহফাতুল আখইয়ার' নামক কিতাবে উক্ত শরিয়ত সম্পর্কীয় ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন, যে কিতাবে স্বয়ং হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী শাহসূফি সৈয়দ আহমদউল্লাহ (কঃ) স্বাক্ষর প্রদান করেছিলেন। তিনি উক্ত কিতাবের ইলমে তাসাওউফ অধ্যায়ে বর্ণনা করেন, 'ফতওয়া আজিজিয়া কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে, শরিয়ত শব্দের দুইটি অর্থ রহিয়াছে আম ও খাস। প্রথম আম শরিয়ত ধর্মীয় কাজে রসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়ে যাহা বর্ণিত অর্থাৎ এতেকাদ, আমল, স্বভাব, নিয়ত, অবস্থা এবং যাহা কোন বিশেষ কারণে ছাড়িয়া দেওয়ার নির্দেশ আছে এবং যাহা ছাড়িয়া না দেওয়ার জন্য দৃঢ় নির্দেশ রহিয়াছে ইত্যাদি সম্বলিত। দ্বিতীয়, খাস শরিয়ত যাহা ইবাদতে মালী ও ইবাদতে বদনী সংক্রান্ত জরুরী আমলের সহিত সম্পর্কযুক্ত। ইহার বর্ণনা ফিকাহর জিম্মাদারি যাহা ফিকাহর কিতাবে উল্লেখ আছে। তরিকতপন্থিরা শরিয়তের উক্ত ব্যাখ্যাই প্রদান করিয়া থাকেন'। (তোহফাতুল আখইয়ার, ২য় খণ্ড, পঞ্চম প্রকাশ ১৪১৭ বাংলা, পৃ.৬৫) সুতরাং ইসলামের নিয়মনীতি, আরকান-আহকাম সম্বন্ধে মুসলমানদের কর্তব্যকর্ম, সাংসারিক সকল প্রকার আচার-ব্যবহার, ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়মাবলী এবং হক্কুল্লাহ-হক্কুলইবাদ বিষয়ে মাসাআলা ইত্যাদির সম্মিলিত রূপ হল শরিয়ত। এই শরিয়তকে দু' ভাগে ভাগ করা হয়েছে, আম শরিয়ত ও খাস শরিয়ত।

আম শরিয়তঃ আম শরিয়ত বলতে বুঝায় যা সর্বসাধারণের জন্য প্রযোজ্য এবং যা পালন করার জন্য দৃঢ় নির্দেশ রয়েছে ও যা কোন বিশেষ জরুরী কারণে ছেড়ে দেওয়ার বিধান আছে। আম শরিয়ত এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদি জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য প্রবর্তিত। যে কেউ উক্ত বিষয়াবলীর অনুগামী হলে, সে এর সুফল প্রাপ্ত হবে এতে কোন সন্দেহ নাই। যেহেতু শেষনবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন নির্দিষ্ট গোত্র বা সম্প্রদায়ের জন্য প্রেরিত নবী নন, বরং তিনি সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য নবী- রাসুল ও রহমত হিসেবে আবির্ভূত; সেহেতু তাঁর প্রতিষ্ঠিত দ্বীনে ইসলাম এর আম শরিয়ত বা সাধারণ শরিয়ত সমগ্র মানবজাতির জন্য আদর্শ জীবন বিধান। তাই তিনি রাহমতুল্লিল আলামিন বা সৃষ্টিকুলের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরিত হন আর তাঁর প্রবর্তিত জীবনাদর্শ বিশ্বজগতের জন্য আদর্শ । তাই আল্লাহ পাক কুরআনে পাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শকে উসওয়াতুন হাসানাহ বা সর্ব উত্তম আদর্শ বলেছেন। আম শরিয়তের পাঁচটি মৌলিক বিষয় হল- এতেকাদ, আমল, নিয়ত, স্বভাব, অবস্থা।

এতেকাদঃ এতেকাদ অর্থ বিশ্বাস। অর্থাৎ আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হল এর মূল এবং রেসালতে বিশ্বাস, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হল এর নির্যাস। তাছাড়া ঈমানের যাবতীয় শাখাসমূহও এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। উপরন্তু, এতেকাদের সাতটি উপাদান রয়েছে, যথা- এক অদ্বিতীয় আল্লাহর উপর বিশ্বাস, ফিরিশতাদের উপর বিশ্বাস, আসমানি কিতাবসমূহের উপর বিশ্বাস, আল্লাহর প্রেরিত নবী- রাসূলগণের উপর বিশ্বাস, পরকালের উপর বিশ্বাস, তকদির বা ভাগ্যের ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর বিশ্বাস। যারা উপর্যুক্ত উপাদান সমূহ পরিপূর্ণ বিশ্বাস করেন তারা ঈমানদার। এরূপ এতেকাদ বা ঈমান বা একিনের তিনটি স্তর রয়েছে। যথা- প্রথমত, এলমুল একিন অর্থাৎ লোকের মুখে শুনে বা পুস্তকে পড়ে যে বিশ্বাস জন্মে, সে বিশ্বাসকে এলমুল একিন বলা হয়। দ্বিতীয়ত, আইনুল একিন অর্থাৎ কোন বিষয় সম্পর্কে গবেষণা করে গবেষণাজাত

ফলাফল দেখে যে বিশ্বাস জন্মে, তা হল আইনুল একিন; যা পূর্বাপেক্ষা দৃঢ় হয়। তৃতীয়ত, হক্কুল একিন অর্থাৎ কোন বিষয় নিজের মধ্যে প্রয়োগজাত অনুভূতির মাধ্যমে যে বিশ্বাস জন্মে তা হল হক্কুল একিন; এরূপ বিশ্বাস সবচেয়ে দৃঢ়তর হয়। যেমন- লোকমুখে শুনে বা বই পড়ে জানা যায় জ্বর হলে মানুষ কাহিল হয়ে পড়ে যা এলমুল একিন স্তরভুক্ত; এর পরবর্তী চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নে গবেষণা মারফত এর স্বরূপ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানা যায়, যা আইনুল একিন; কিন্তু জ্বর যখন নিজের শরীরে মানুষ অনুভব করে, তখন এর ফলাফল ও তীব্রতা স্বয়ং উপলব্ধি করতে পারে যা হক্কুল একিন ভুক্ত। শোনা কথায় বিশ্বাস কিংবা দলিল প্রমাণভিত্তিক বিশ্বাস নতুন কথা কিংবা নতুন দলিলে ও যুক্তিতর্কে বিনষ্ট করা যায়, কিন্তু যা নিজের ভিতর অনুভব করা যায় তার বিশ্বাস অটল ও অবিচল। তাই হক্কুল একিন হাসিলের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার প্রত্যয়ে যুগে যুগে বিভিন্ন তরিকত পন্থার উদ্ভব, যা শরিয়তের বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করে এবং চরিত্রকে উন্নত করে। এ কারণে মাইজভাণ্ডারী তরিকায় হক্কুল একিনের প্রাধান্য স্বীকার করা হয়। এ প্রসঙ্গে হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর নিম্নোক্ত বাণী সমূহ প্রনিধানযোগ্য-'হাসরের দিন আমিই প্রথম বলিব লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', 'ফিরিশতা ক্বালেব বনে যাও', 'কুজ্ঝাসকের মত নিজ হুজরায় বসে আল্লাহর প্রশংসা কর'। (মাইজভাণ্ডারী দর্শন উৎপত্তি বিকাশ ও বিশেষত্ব, ড মুহাম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী, দ্বিতীয় প্রকাশ ২০০৫, পৃঃ৬৮)

আমল: আমল বা কর্ম পূর্বোল্লিখিত এতেকাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত বিষয়। কর্মকে সাধারণত দুইভাগে ভাগ করা হয়। ভাল কর্ম, মন্দ কর্ম, ন্যায়-অন্যায়। শরিয়তের অন্তর্ভুক্ত 'আমল' বলতে বুঝায় সে সব কর্ম করা যা করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং সে সব কর্ম হতে বিরত থাকা বা না করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উপর্যুক্ত ভিত্তির উপর ইসলামী শরিয়তে প্রধানত পাঁচ প্রকারের আমলের সন্ধান পাওয়া যায়। 'যে গুলো অবশ্য পালনীয় বিধান সেগুলো ফরজ, যেগুলো অবশ্যই বর্জনীয় সেগুলো হারাম। এ দু'টির মাঝখানে যেগুলো করা উচিত বলা হয়েছে সেগুলো মান্দুব, আর যেগুলো করা উচিত নয় সেগুলো মাকরূহ। আর যেগুলো দ্বীনের জন্য ক্ষতিকর নয় এবং যেগুলোর নিষেধসূচক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন হুকুম পাওয়া যায় না সেগুলো মোবাহ বা জায়েজ। (outlines of muhammadan law, asaf a.a. fyzee, page-17) আমলের সাথে এতেকাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হেতু যেটার উপর একজন মানুষের বিশ্বাস রয়েছে সে অনুযায়ী আমল করাই হল ঈমানের পরিচায়ক। তাই আমলকে ঈমানের অংশস্বরূপ বলা হয়েছে। শরিয়তের বিধান হল ফরজ আমল সমূহ পালন করা অবশ্যই কর্তব্য নচেৎ গুনাহগার হবে এবং হারাম আমল সমূহ থেকে সর্বদাই বিরত থাকা কর্তব্য নচেৎ গুনাহগার হবে। তাছাড়া মান্দুব আমল সমূহ নিয়মিত পালনের চেষ্টা করা উচিত ও মাকরূহ আমল সমূহ থেকে দূরে থাকা কর্তব্য এবং মোবাহ বা জায়েজ আমল সমূহ পালনে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আল্লাহর প্রিয় আউলিয়া এ কেরামের ভালবাসা ঈমানের অংশ, কিন্তু আমাদের ভালবাসার নমুনা যদি হয় তাঁদের আদর্শের পরিপন্থি; যে সব কাজে ভালবাসার মানুষকে খুশী করার পরিবর্তে দুঃখ দেয় তা কেমন ভালবাসা হল? যে বিষয়ের উপর আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম কিন্তু সে অনুযায়ী আমল করলাম না, সেটা হল ভংগুর ঈমান। কথা ও কাজের বৈপরীত্য ঈমানের পরিচয়ই বহন করে না। আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম আল্লাহ সব দেখেন, সব জানেন, সব শোনেন, তাঁর নিকট কিছুই গোপন নেই। কিন্তু জীবনযাত্রার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যদি আমরা বিভিন্ন মন্দ কর্ম যেমন- সুদ খাওয়া, ঘুষ খাওয়া, মিথ্যা বলা, গীবত করা, চোগলখুরী করা, প্রতারণা করা, ওজনে কম দেয়া, জুলুম করা ইত্যাদিতে লিপ্ত হই সেটা কি আমাদের বিশ্বাসের উপর আমল হল? তাই মাইজভাণ্ডারী তরিকার প্রবর্তক হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) কালাম করেছেন, 'কবুতরের মত বাহিরা খাও, হারাম খাইও না'। (বেলায়তে মোতলাকা, খাদেমুল ফোকরা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন, ৭ম সংস্করণ, পৃঃ৯৪) তাছাড়া মাইজভাণ্ডারী তরিকার অনুসারিদের একটি বৈশিষ্ট্য হল তারা ভালকাজে উৎসাহ প্রবণ ও মন্দ কর্ম বিরতকারী; যে কারণে হযরত কেবলা (কঃ) কালাম করেছেন, 'আমার ছেলেরা সবসময় রোজা রাখে'। (প্রাগুক্ত, পৃঃ৮৩)

নিয়ত: নিয়ত বলতে কোন কাজের প্রতি মনের প্রবল প্রেরণা এবং নিখাদ বিশ্বাস ও ইচ্ছাকে বুঝায়। সকল কাজের পিছনে একটা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে আমরা নিয়ত বলে অভিহিত করে থাকি। রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'ইন্নামাল আ'মালু বিন নিয়ত' অর্থাৎ সকল কাজের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। (বুখারি শরীফ) উক্ত হাদিস শরিফের আলোকে দেখা যায় যে, নিয়তের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাপক। কোন মানুষের নিয়তের অবিশুদ্ধতা ও অসামঞ্জস্যতার ফলে তার নেক আমল সমূহও বিনষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ পাক

কুরআনে পাকে ঘোষণা করেছেন, 'তারা তো কেবল ইখলাসের সাথে ইবাদত করতে, একনিষ্ঠভাবে সালাত কায়েম করতে, যাকাত প্রদান করতে আদিষ্ট হয়েছে, আর এটাই খাঁটি ধর্ম'। (সূরা আল বায়্যিনাতঃ ০৬) প্রকৃত নিয়ত হবে আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সন্তুষ্টির জন্য, কেননা রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত ইমানদার নও, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের খাহেশাত আমি যা নিয়ে এসেছি তার অনুগত না হয়'। (হাদিস শরীফ) এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন, 'আপনি বলে দিন, হে মানবকুল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তবে আমার অনুগত হয়ে যাও, আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু'। (সূরা আলে ইমরানঃ ৩১) কুরআনের এ বাণীতেই আনুগত্যের কৌশল বিবৃত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে হাকিকতে মোহাম্মদীর আনুগত্যের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তাই সকল কাজে নিয়তের বিশুদ্ধতা অর্জন করা অপরিহার্য, কেননা রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয়ই আমলের বিনিময় নির্ধারিত হবে নিয়তের ভিত্তিতে; আর প্রত্যেক ব্যক্তি সে রকমই সওয়াব পাবে যে রকম সে নিয়ত করেছে'। (বুখারি শরীফ) তাই নিয়তের বিশুদ্ধতা আনয়নের তাগিদ দিয়ে হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) কালাম করেছেন, 'আমার নিকট একটি পাটী বেতের বা ঘইস্যা ডাওলসের ফুলও কি নিয়ে আসতে পার নাই'। (বেলায়তে মোতলাকা, প্রাগুক্ত, পৃঃ৯৪) উক্ত বাণীতে পাটী বেতের বা ঘইস্যা ডাওলসের ফুল বলতে অন্তরের স্বচ্ছতা ও নিয়তের বিশুদ্ধতার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

স্বভাব: আমাদের চাল-চলন, ব্যবহার, আচার-আচরণ ইত্যাদির মাঝে আমাদের স্বভাব মূর্ত হয়ে উঠে। 'মানুষ যা অভ্যাস করে তাই স্বভাবে পরিণত হয়। স্বভাবই কর্মে বিকশিত হয়। স্বভাবকে কেউ কেউ খাজলির রোগ বলে। কোন রোগে মানুষকে ভবসাগর পার করে, কোন রোগে সাগরে ডুবিয়ে মারে। প্রেমাগুণে পুড়ে মানুষ শুদ্ধ ও মুক্ত হয়। কামাগুণে পুড়ে মানুষ বিনাশী ও সর্বহারা হয়। জপ-তপ, ধ্যান-সাধনা, পাগলামি, হিংসা-নিন্দা, মান, অহঙ্কার, গৌরব, ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, প্রেমপ্রীতি ইত্যাদি সকলই খাজলির রোগ'। (রেনেসাঁর আলো, ফকির মোহাম্মদ ফরিদ হোসেন,প্রথম প্রকাশ ২০০২ইং,পৃঃ৪১) মানুষের স্বভাবের মাধ্যমেই চরিত্র সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তাই চারিত্রিক কাঠামো গঠনে স্বভাবের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন: কারো স্বভাবে অহঙ্কার প্রকাশ পেলে তার চরিত্র নির্ণীত হয় অহংকারী হিসেবে; আবার কারো চরিত্রে বিনয় প্রকাশ পেলে তার চরিত্র নির্ণীত হয় নিরহঙ্কার/ বিনয়ী হিসেবে। মাইজভাণ্ডারী তরিকায় মানুষের নফস সাত স্তরের মর্মে স্বীকার করা হয়, যথা- নফসে আম্মারা, নফসে লওয়ামা, নফসে মোলহেমা, নফসে মোতমাইন্না, নফসে রাজিয়া, নফসে মর্জিয়া ও নফসে কামেলা। ব্যক্তির নফসের স্তরভেদে তার স্বভাব প্রকাশ পায়। নফসে আম্মারা হল সর্বনিম্ন স্তর, এ স্তর সম্পর্কে আল্লাহর বাণী হল, 'নিশ্চয়ই নফসে আম্মারা মন্দ কর্মের নির্দেশ দাতা'। (সূরা ইউছুফ,আয়াত ৫৩) তাই এ স্তরের বৈশিষ্ট্য হল ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। এ স্তরের সাধারণ স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য হল কামপ্রবৃত্তি, লোভ-মোহ, হিংসা-নিন্দা, ঝগড়া বিবাদ, গীবত-পরচর্চা, চোগলখুরি, পরশ্রীকাতরতা, অহঙ্কার, কপটতা, দুনিয়াদারী প্রভৃতি। মাইজভাণ্ডারী তরিকায় নফসে আম্মারা থেকে পরিত্রাণের সহজ পন্থা বিবৃত হয়েছে 'ফানায়ে ছালাছ' তে; এ প্রসঙ্গে হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর নিম্নোক্ত বাণী প্রণিধানযোগ্য, 'আমি ছাগল দিয়া বলদ দাবাই, ভেড়া দিয়া ভৈষ দাবাই, বানর দিয়া বাঘ দাবাই'। (বেলায়তে মোতলাকা, প্রাগুক্ত, পৃঃ৬৭) উক্ত বাণীতে যথাক্রমে পবিত্র ও হালাল উপায়ে জীবনাচরণের মাধ্যমে হারাম ও খোদাভুলা দুনিয়াদারী থেকে পরিত্রাণ, অনর্থ পরিহার ও আনুগত্যের স্বভাব অর্জনের মাধ্যমে অহংকার ও পাপ কর্ম থেকে মুক্তি এবং মানবীয় গুণ হাসিল ও আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতার মাধ্যমে হিংসা-নিন্দা ও লোভ-মোহ বিনাশের দীক্ষা প্রদান করা হয়েছে। নফসে লওয়ামা স্তরের বৈশিষ্ট্য হল প্রেম, ভালবাসা। এ স্তরের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য হল সৎকার্যে অনুরাগ, মন্দ কার্যে বিরাগ, আত্মকেন্দ্রিকতা, অনুশোচনা প্রভৃতি। নফসে মোলহেমা স্তরের বৈশিষ্ট্য হল কামনাশূন্য প্রেম। এ স্তরের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য হল সংযম সাধনা, দুনিয়াবিমুখতা, পরোপকার, আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞচিত্ত হওয়া, অনুসন্ধানী প্রভৃতি। নফসে মোতমাইন্না স্তরের বৈশিষ্ট্য হল একাগ্রচিত্ততা। এ স্তরের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য হল সন্তুষ্টচিত্ততা, ধ্যান- সাধনা, প্রজ্ঞা, আত্মনির্ভরশীলতা, পরোপকার প্রভৃতি। নফসে রাজিয়া স্তরের বৈশিষ্ট্য হল নিশ্চিন্তভাব। এ স্তরের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য হল পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণ, স্বজ্ঞা প্রভৃতি। নফসে মর্জিয়া স্তরের বৈশিষ্ট্য খোদায়ী প্রেরণা। এ স্তরের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য হল সংস্কারমুক্তি, মানবতাবাদ, ভাব বিভোরতা, চিন্তার স্বাধীনতা প্রভৃতি। সর্বশেষ নফসে কামেলা স্তরের বৈশিষ্ট্য হল বিশ্বদরদি ভাব। এ স্তরের স্বভাবজাত

বৈশিষ্ট্য হল পবিত্রতা, বিশ্বসংস্কার, ইচ্ছার স্বাধীনতা প্রভৃতি। উক্তরূপ নফসের স্তরানুযায়ী মানুষের স্বভাবের পরিবর্তন হয় এবং মানুষ উন্নত চরিত্রের সোপানে আরোহন করতে সমর্থ হয়। রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'আমি একমাত্র মানবজাতিকে চারিত্রিক মানের উচ্চ সোপানে আরোহন করানোর জন্য প্রেরিত হয়েছি'। (বেলায়তে মোতলাকা, প্রাগুক্ত, পৃঃ৯১) হাদিস শরীফে আরও ইরশাদ হয়েছেন, 'মুমিন ব্যক্তি তার উত্তম চরিত্র দ্বারা সেই ব্যক্তির মর্যাদায় পৌঁছে যায়, যে দিনভর রোজা রাখে, রাতভর সালাতে রত থাকে'। (আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ) হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর কালামে পাকে উন্নত স্বভাব অর্জনের মাধ্যমে উন্নত চরিত্র গঠনের তাগিদ পাওয়া যায় বারবার; যেমন- 'নিজের হাতে পাকাইয়া খাও, পরের হাতে পাকানো খাইও না; আমি বার মাস রোজা রাখি, তুমিও রোজা রাখিও'; (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮১) 'এখানে হাওয়া দাফন করা হয়েছে, ইহা বাবা আদমের কবর' (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৪)।

অবস্থাঃ পবিত্র কুরআন হতে মানুষের ত্রিবিধ অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রথমত, নফসে আম্মারা হতে উদ্ভূত স্বভাবজাত অবস্থা; দ্বিতীয়ত, নফসে লওয়ামা হতে উদ্ভূত নৈতিক অবস্থা ও তৃতীয়ত, নফসে মোতমাইন্না হতে উদ্ভূত আধ্যাত্মিক বা রূহানী অবস্থা। (আল কুরআন ও মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকার আলোকে আত্মশুদ্ধির দিক নির্দেশনা, শাহ্জাদা মৌলভী সৈয়দ লৎফুল হক, প্রথম প্রকাশ, পৃঃ ১৩,২৬,৪২) নফসে আম্মারা হতে উদ্ভূত স্বভাবজাত অবস্থায় যে সব বিষয়ের বিকাশ হয়ে থাকে সেগুলো হল- কামস্পৃহা, আহার-নিদ্রা, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহঙ্কার প্রভৃতি। উক্ত বিষয় সমূহ নিয়ন্ত্রণে ও বিনাশে কুরআনিক বিধান প্রতিপালনই আম শরিয়তের অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণ স্বরূপ, কামস্পৃহা দমনে কুরআনে নারী পুরুষকে পরস্পর বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং এ সম্পর্কিত কিছু বিধি-বিধানও দেয়া হয়েছে। যেমন- পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'সচ্চরিত্রবতী মুসলিম নারীগণ ও পূর্ববর্তী ঐশী কিতাবধারী সচ্চরিত্রবতী নারীগণ হতে তোমাদের বিয়ে করা বৈধ, যখন তোমরা তাদের মোহর প্রদান করবে বিয়ে বন্ধনে আনার জন্য, ব্যভিচারের জন্য নয় এবং উপপত্নি বানানোর জন্যও নয়'। (সূরা মায়িদা, আয়াত ৫) এছাড়া পবিত্র কুরআনে পানাহারের বিষয়ে হালাল- হারাম সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে এবং হালাল খাদ্য ভক্ষণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, 'তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তু সমূহ হালাল করা হয়েছে'। (সূরা মায়িদা,আয়াত ৪) এভাবে পবিত্র কুরআন ও হাদিসে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে, যেমন পবিত্র কুরআনে আরও ইরশাদ হয়েছে, 'মদ, জুয়া, মূর্তি এবং ভাগ্য নির্ণায়ক শর অপবিত্র, শয়তানি কাজ। সুতরাং তোমরা তা থেকে বেঁচে থাকো'। (সূরা মায়িদা,আয়াত ৯০) দ্বিতীয়ত নফসে লওয়ামা হতে উদ্ভূত মানুষের নৈতিক অবস্থায় যেসব নৈতিক গুণাবলীর বিকাশ হয়ে থাকে সেগুলো হল- আমানত, দিয়ানত, অনর্থ পরিহার, নম্রতা, সত্যবাদিতা, ধৈর্য বা সবর, সহানুভূতি, আল্লাহভীতি প্রভৃতি। এ অবস্থায় মানুষের আখলাক সুসংগঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এতে যদি মানুষ নিজের আখলাক বা চরিত্র সুসংগঠনে ব্রতি হতে পারে, তবে উন্নত চরিত্র অর্জনের প্রাথমিক ধাপ অতিক্রম করা যায়। তৃতীয়ত নফসে মোতমাইন্না হতে উদ্ভূত আধ্যাত্মিক অবস্থার সূচনা হয় নুরে ইলাহি লাভের মাধ্যমে, এর ফলে মানুষ এক নবতর জীবন লাভ করে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'হে শান্তি প্রাপ্ত আত্মা, স্বীয় প্রতিপালকের দিকে ফিরে যাও। এমতাবস্থায় যে তুমি তাঁর উপর সন্তুষ্ট এবং তিনি তোমার উপর সন্তুষ্ট। অতঃপর তুমি আমার খাস বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার বেহেশতে প্রবেশ করো'। (সূরা ফাজ্‌রি, আয়াত ২৭-৩০) আল্লাহ পাক আরও ইরশাদ করেছেন, 'এরা হচ্ছে ঐ সমস্ত বান্দা যাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান অঙ্কিত করে দিয়েছেন এবং তাঁর নিকট থেকে রুহ দ্বারা তাঁদের সাহায্য করেছেন এবং তিনি তাঁদেরকে স্বর্গ উদ্যানে প্রবেশ করাবেন যার নিম্নে স্বচ্ছ স্রোতস্বিনী সমূহ প্রবাহিত তন্মধ্যে তাঁরা সর্বদা অবস্থান করবে। আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা আল্লাহর দল, শুনছো আল্লাহরই দল সফলকাম'। (সূরা মুজাদালাহ,আয়াত ২২) উক্তরূপ আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, নফসে মোতমাইন্না, নফসে রাজিয়া, নফসে মর্জিয়া ও নফসে কামেলা আধ্যাত্মিক অবস্থার অন্তর্গত আর নফসে মোলহেমা নৈতিক অবস্থার অন্তর্ভুক্ত এবং নফসে আম্মারা, নফসে লওয়ামা স্বভাবজাত অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 'হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী। সুতরাং আর কোন নবী আসবেন না, কারণ নবুয়তের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রেসালতের আরেকটি অংশ বেলায়তের দরজা বন্ধ হয় নি। তাই হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছ থেকে বেলায়ত প্রাপ্ত যাঁরা হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক মনোনীত আল্লাহর বন্ধু তাঁরাই অলিউল্লাহ। অলিউল্লাহগণের অবস্থান হল রূহানী অবস্থায়, মোমেনে ছালেহদের অবস্থান ক্ষেত্র হল নৈতিক অবস্থায় ও

সাধারণ মোমেনদের অবস্থান ক্ষেত্র হল স্বভাবজাত অবস্থায়' (মাইজভাণ্ডারী তরিকার হাকিকত, সৈয়দ মুহাম্মদ ফখরুল আবেদীন রায়হান, প্রথম প্রকাশ ২০০৭, পৃঃ ১৯২)

খাস শরিয়তঃ খাস শরিয়ত বলতে বুঝায় শরিয়তের আহকাম সমূহ যেগুলো প্রতিপালনের ক্ষেত্রে কিছু পূর্বশর্ত পূরণ করতে হয়। অর্থাৎ শরিয়তের যেসব আমল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও যার পূর্বশর্ত পুরণ করতে হয়। অর্থাৎ শরীয়তের যে সব আমল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও যার পূর্বশর্ত প্রতিপালন ব্যতিরেকে আমল করা ইসলামী শরিয়তে অগ্রহণযোগ্য। যেমন- খাস শরিয়তের প্রথম পূর্বশর্ত হল পালনকারীকে অবশ্যই মুসলমান হতে হবে। আম শরিয়ত ও খাস শরিয়ত এর মৌলিক পার্থক্য হল আম শরিয়ত যে কেউ প্রতিপালন করতে পারে, যা সবার জন্য উন্মুক্ত এবং যে কাউকে আম শরিয়ত এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদির প্রতি ধাবিত করতে উৎসাহ প্রদান করা হয়। অপরদিকে খাস শরিয়ত যে কেউ প্রতিপালন করতে পারে না, যা শুধুমাত্র মুমিন- মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য এবং মুসলমান ব্যতিত অন্য কেউ এর বিধিবিধান প্রতিপালন নিষিদ্ধ। আমরা সংক্ষেপে শুধু এটুকু বলতে পারি, আম শরিয়ত প্রতিপালনে একজন ব্যক্তি মুমিন- মুসলমান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয় আর সেই মুমিন- মুসলমানের উপর খাস শরিয়ত কর্তব্য কর্ম ও আত্মিক উন্নতির বাহন হিসেবে নির্ধারিত। খাস শরিয়তের দু'টি মৌলিক বিষয় হল- ইবাদতে বদনী ও ইবাদতে মালী।

ইবাদতে বদনীঃ ইবাদতে বদনী সেসব জরুরী আমল যেগুলো খাস শরিয়তের অন্তর্ভুক্ত, এর আভিধানিক অর্থ হল শরীরের মাধ্যমে যে ইবাদত করা হয়। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত অবশ্য করণীয় যে ইবাদত সমূহ ইবাদতে বদনী হিসেবে স্বীকৃত সেগুলো হল নামাজ, রোজা, হজ্জ। নামাজের জন্য কিছু পূর্বশর্ত রয়েছে, যেমন- মুমিন-মুসলমান হওয়া, পাক পবিত্র হওয়া, ওযু করা, নামাজের জায়গা পাক হওয়া প্রভৃতি। তদ্রুপ রোজার কিছু পূর্বশর্ত আছে, যেমন- ঈমানদার হওয়া, সময় রমজান মাস হওয়া, সেহেরী খাওয়া প্রভৃতি। অনুরূপভাবে হজ্জেরও কিছু পূর্বশর্ত বিদ্যমান, যেমন- মুমিন- মুসলমান হওয়া, হজ্জ করার সামর্থ্য অর্জন করা, ইহরাম পরিধান করা প্রভৃতি। পাঁচ ওয়াক্তিয়া নামায, রমজানে রোজা, জিলহজ্জের হজ্জ এসব হল এগুলোর বাহ্যিক অবয়ব, যা খাস শরিয়তের অন্তর্ভুক্ত। নামাজ, রোজা, হজ্জের নিয়ম-পদ্ধতি, গুরুত্ব-তাৎপর্য ইত্যাদি ইলমে ফিকাহ ও ইলমে আকাইদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু পূর্ণতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ, ইলমে তাসাওউফের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ বুজুর্গবৃন্দ এসব জরুরী আমলসমূহের বিকশিত ও সম্প্রসারিত রূপ দিয়েছেন যা ছালেক বা খোদাপন্থিদের জন্য বিশেষ উপকারী হিসেবে স্বীকৃত। ইলমে তাসাওউফ থেকে উৎসারিত সেসব আমল সমূহের কয়েকটি হল- জিকির, মোরাকাবা, মোশাহেদা, ফিকির, নফল রোজা, পানাহার ত্যাগ, কঠোর রেয়াজত, জেয়ারত প্রভৃতি। এসব নামাজ, রোজা, হজ্জের অস্বীকৃতি নয়, বরং এর সহায়ক শক্তি যা ছালেকের ইবাদতে খুলুছিয়ত সৃষ্টি করবে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, ফা'বুদুল্লাহা মুখলিছান লাহুদ্দীন অর্থাৎ 'আল্লাহর দ্বীনের উপর খুলুছিয়তের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদতে রত হও'। (আল কুরআন) ফানায়ে নফস ব্যতীত খুলুছিয়ত সৃষ্টি হয় না। তাই মাইজভাণ্ডারী তরিকায় ফানায়ে নফসের সাধনা ও ইবাদতে বদনীর তাগিদ দেয়া হয়েছে। হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) কালাম করেছেন, 'তাহাজ্জুদের নামাজ পড়'; 'সালাতুত তসবিহর নামাজ পড়'; 'আইয়ামে বীজের রোজা রাখ'। (বেলায়তে মোতলাকা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৪) প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উক্ত সকল আমল সর্বসাধারণের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়।

ইবাদতে মালীঃ ইবাদতে মালী হল খাস শরিয়তের অন্তর্ভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ আমল। এর আভিধানিক অর্থ হল মাল বা সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে যে ইবাদত সম্পন্ন করা হয়। মালের যে ইবাদত সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর ফরজ বা অবশ্য করণীয় সেটি হল যাকাত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআনে করীমে প্রায় স্থানে নামাজের সাথে সাথে যাকাতের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন। আর হজ্জ হল এমন একটি ইবাদত যেটি ইবাদতে মালী ও ইবাদতে বদনী উভয়ের একটি সমন্বিত রূপ। তবে হজ্জকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরিকা অনুযায়ী আমল করাই কর্তব্য হওয়া প্রয়োজন। সহিহ ও নির্ভেজাল ভাবে জিলহজ্জের হজ্জ আদায়েও ইলমে তাসাওউফ আবশ্যক। আর ইলমে তাসাওউফ উৎসারিত হজ্জের আদর্শ ভিত্তিক বিকশিত রূপ হল নবী অলির রাওজা শরীফ জিয়ারত, অসহায়কে সাহায্য প্রদান, পীরে কামেলের আনুগত্য প্রভৃতি। তাই হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী কালাম করেছেন, 'আদব করো। ইয়ে আদব কা মোকাম হ্যায়। তোমহারে পাওকে নীচে কুরআন হ্যায়'। (গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত, অষ্টম প্রকাশ ১৯৮৯ইং, পৃঃ ৭৮) অনুরূপভাবে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও বণ্টন যাকাতের বিকশিত রূপ হিসেবে সাব্যস্ত। অপরদিকে কুরবানি মালের ইবাদত হলেও এটা মূলতঃ ঐশীপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ। যা হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর সুন্নাত হিসেবে নূর নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালন করেছেন, উম্মতকে পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি আনুগত্যর কারণেই উম্মতে মোহাম্মদী কুরবানি পালন করে থাকে। তাই এর মূল শিক্ষা হল নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্য ও ভালবাসা। একইভাবে তাসাওউফের ইলম থেকে উৎসারিত শরিয়তের আমলের বিকশিত রূপ হল কামেলে মোকাম্মেল অলিআল্লাহর ওরশ শরীফ উদযাপন, ওরশ শরীফে হালাল পশু জবেহ করে খাওয়ানো সবই প্রেমের বহিঃপ্রকাশস্বরূপ কুরবানির আদর্শকে ধারণ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত গ্রন্থে হযরত মওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী বর্ণনা করেন যে, 'একদা পড়শি মহল্লা সরদার ছায়াদ উদ্দিন ও আছহাব উদ্দিন দ্বয়কে হযরত আকদাছ বলিয়াছিলেন, 'তোমরা হিসাব কর দেখি ১২০ টি গরু, ভইষ (সংখ্যা উল্লেখ করিয়াছিলেন আমার মনে নাই, তদ্রূপ ছাগল ও ভেড়ার সংখ্যা ও নির্ণয় করিয়াছিলেন) পাক করিয়া খাওয়াইতে কি পরিমান চাউল, মরিচের গুড়া, ডাইলের গুড়া (তৎকালীন চট্টগ্রামী জিয়াফতে কলইর গুড়ার ডাল তৈরি করার প্রচলন ছিল) এবং কয় খাঁছি মূলা লাগিবে'। (প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৯) উক্ত কালাম হযরতের ওরশ শরিফ পালনের নির্দেশনা রূপেই প্রতিভাত।

ইবাদতে বদনী ও ইবাদতে মালী পালনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল রিয়া বা লোক দেখানো। এসবের ক্ষেত্রে নফস ও শয়তানের ধোঁকায় পতিত হয়ে রিয়া বা লোক দেখানো ইবাদতের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে, যা শিরিকে আজগরের নামান্তর। আর এ থেকে উত্তরণের জন্য, নফস শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচার জন্য সুষ্ঠু তরিকতচর্চার প্রয়োজন। আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে মিরাজের রাতে আল্লাহর ৯০ হাজার কালাম হয়েছে। এর মধ্যে মাত্র ৩০ হাজার কালামের বিষয় সর্বসাধারণের মধ্যে প্রকাশ করেছেন, যা ইলমে ফিকাহ ও ইলমে আকাইদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এর বাইরেও বাকি ৬০ হাজার কালাম ব্যক্ত করেছেন তাঁর প্রিয় সাহাবী ও আহলে বাইতদের নিকট; আর তাই আহলে বাইতদের বাহন তথা তরিকাই হল সর্বোত্তম ও হক। এই ৬০ হাজার কালামের জ্যোতি ছাড়া প্রকাশিত ৩০ হাজার কালামের গূঢ় তত্ত্ব ও উদ্দেশ্য বুঝা সম্ভব নয়। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, 'আমি হুজুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছ থেকে দুই পেয়ালা ইলম শিক্ষা করেছি। এক পেয়ালা প্রকাশ করেছি, আর এক পেয়ালা যদি প্রকাশ করি আমার গলা কাটা যাবে'। (বুখারি শরীফ) আর হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে আল্লাহর এই ৬০ হাজার কালামই হল ইলমে তাসাউফের কালাম। এই কালামের ফয়জ সীনা থেকে সীনাতে প্রবাহিত হয়। আর তাই হাকিকতে নূরে মোহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তথা আহলে বাইত ও পীরে কামেলের আনুগত্যের মাধ্যমে গুপ্ত কালামসমূহের পরশ পাওয়ার চেষ্টা করা কর্তব্য। মসনবীতে মওলানা রুমী (রাঃ) বলেন,

'গুপ্ততত্ত্ব ভেদ কী জানে নাদানে,
যাহাতে বিভিন্ন রয়েছে এইখানে'।

শরিয়ত ও মাইজভাণ্ডারী তরিকা: মাইজভাণ্ডারী তরিকায় আম শরিয়ত ও খাস শরিয়ত উভয়বিধ শরিয়তের খালেছ বা নির্ভেজাল প্রতিপালনের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছে। যদি আমরা মাইজভাণ্ডারী তরিকার আদর্শের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তবে দেখতে পাই যে, এই তরিকায় সমগ্র বিশ্ববাসীকে প্রথমই দ্বীনে ইসলামের আম শরিয়তের দিকে আহবান করেছে, যাতে মানুষ চারিত্রিক শুদ্ধতা আনয়নের মাধ্যমে আজলি মুসলমান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, আম শরিয়ত এর প্রতিপালনকারীকে মুমিন-মুসলমান বলা হয়, যিনি সৎ চরিত্রের অধিকারী। কেননা হাদিস শরিফ অনুযায়ী মিথ্যাশ্রয়ী বা মিথ্যুক ব্যক্তি মুমিন পদবাচ্য নয়। আর সেই মুমিন-মুসলমান এর চরিত্রের বিকাশ সাধন ও আল্লাহর দিদার লাভের মাধ্যম হল খাস শরিয়তের যথাযথ অনুশীলন। এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, খাস শরিয়তের সুষ্ঠু অনুশীলন ব্যতীত আল্লাহর দিদার ও নৈকট্য লাভের চিন্তা করা যায় না। মাইজভাণ্ডারী তরিকায় আম শরিয়তের প্রাত্যহিক অনুশীলন এবং খাস শরিয়তের যথাযথ প্রতিপালনের শিক্ষার মাধ্যমে অতি অল্প সময়ে এত অধিক সংখ্যক উন্নত আদর্শ মানব তথা অলিআল্লাহর সৃষ্টি হয়েছে, যা হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর উন্মুক্ত বেলায়তে ওজমার অবারিত বাধাহীন বিকাশ হিসেবে পরিগণিত। তাই মাইজভাণ্ডারী তরিকা ইলমে তাসাওউফের অপার সমুদ্র রূপে দ্বীনে ইসলামের প্রকৃত স্বরূপকেই ধারণ করে আছে। এটি এ যুগে মাইজভাণ্ডারী তরিকার উপযোগিতাই আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। আল্লাহ আমাদের গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (কঃ)'র পাক কদমের ছায়ায় স্থান দান করে ইলমে তাসাওউফের পরশ দান করুন, আমিন। বেহুরমতে সায়্যিদিল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আত্মার স্বরূপঃ
ইসলামী চিন্তাধারা ও কার্যক্রমের পুনঃজীবন

মূল : এম. ফেতুল্লাহ গুলেন
অনুবাদ : মুহাম্মদ ওহীদুল আলম

[এম. ফেতুল্লাহ গুলেন বর্তমান যুগের একজন প্রভাবশালী ইসলামী চিন্তাবিদ, পন্ডিত লেখক, বাগ্মী ও আদর্শ প্রচারক এবং সমাজ সংস্কারক। তুরস্কের এ মহান পন্ডিত লেখক বর্তমানে আমেরিকায় বসবাস করেন। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ৬০টি। তিনি ইসলামের শাশ্বত মর্মবাণী– যা পুরনো হয়েও চির আধুনিক, যা মানবিকতার সকল দিককে উম্মোচিত করেও গভীর ভাবে আধ্যাত্মিক, যা ব্যক্তির মর্যাদা রক্ষা করেও সমষ্টির স্বার্থকে সংরক্ষণ করে, যা একাধারে ব্যক্তির মুক্তিকামী হয়েও বিশ্ব মানবতার জাগরণকামী, যা দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে ভারসাম্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠার স্রষ্টা প্রদত্ত হাতিয়ার - তারই স্বরূপ উম্মোচন করেন একান্ত এক নিজস্ব ভঙ্গীতে, লেখায় ও বক্তৃতায়। সে মহান ব্যক্তিত্বের সাথে বাংলাদেশী পাঠকদের পরিচয় ঘটিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে মাসিক আলোকধারার পক্ষ থেকে তাঁর রচনার কিছু অংশ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে।]

পূর্বপ্রকাশিতের পর

মহান আল্লাহর প্রকাশ ক্ষমতা সুলভ সিফাত থেকে পবিত্র কুরআনের উৎপত্তি। এ কুরআন সকল অস্তিত্বের মূল ও সুখের একক উৎস। বিশ্ব জগতরূপ গ্রন্থটি হচ্ছে এ সত্যের ধারক এবং বিজ্ঞানের যে সমস্ত শাখা প্রশাখার সাথে এ গ্রন্থ সম্পৃক্ত তা প্রত্যক্ষভাবে এ পৃথিবীর ও পরোক্ষভাবে পরজগতের গতিশীলতার সূত্র। তাই এ গ্রন্থ দু'টোর যুগপৎ অধ্যয়ন ও উভয়ের শিক্ষাকে জীবনে অনুশীলন এবং তদনুযায়ী পুরো জীবনকে সাজিয়ে নেয়া একটি পুরস্কারযোগ্য ও প্রশংসনীয় কাজ। পক্ষান্তরে এ গুলোর প্রতি অবহেলা প্রদর্শন, অবজ্ঞা প্রকাশ এবং এমনকী এগুলোর ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ হওয়া ও জীবনে প্রয়োগ না করা স্বভাবতই শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

খ. মানুষের প্রকৃত মূল্য খুঁজতে হয় তার চেতনাবোধ, চিন্তাধারা ও চরিত্রের মধ্যে। আল্লাহ ও মানুষের কাছে একজন ব্যক্তির গুণাবলী, মর্যাদা ও অবস্থান কেমন তাও খুঁজতে হবে একইভাবে। উন্নত মানবিক গুণাবলী, চিন্তা-চেতনার গভীরতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রভৃতি একটি মানুষের চলমান সনদপত্রের মত যা সকলের কাছে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য। অবিশ্বাসীদের চিন্তা চেতনার সাথে মিশিয়ে যে ব্যক্তি তার ঈমান ও বোধ বিশ্বাসকে কলুষিত করে ফেলে, চরিত্রহীনতার কারণে যে ব্যক্তি চারপাশে উদ্বেগ ও আতঙ্ক ছড়ায়, সে কখনো মহান সত্যের সাহায্য ও অনুগ্রহ লাভ করতে পারেনা। মানুষের কাছে তার খ্যাতি মর্যাদা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখাও সম্ভব হয় না। জনসাধারণ এবং মহান আল্লাহ তা'আলা মানবিক গুণাবলী ও চারিত্রিক উৎকর্ষতার ভিত্তিতে ব্যক্তি মানুষের মূল্যায়ন ও পুরস্কার নির্ধারণ করেন। এ কারণেই মানবিক গুণাবলীতে যারা দুর্বল ও চারিত্রিক উৎকর্ষতায় যারা পিছিয়ে তারা কখনো মহৎ কিছু অর্জন করতে পারে না, কোন সময় কিছু অর্জন করলেও তা স্থায়ী হয় না। যদিও আপাত দৃষ্টিতে তাদেরকে উত্তম বিশ্বাসী মনে করা হয়। অন্য দিকে যারা চারিত্রিক উৎকর্ষতায় অগ্রণী এবং উন্নততর মানবিক গুণাবলীতে গুণান্বিত কদাচিত তারা ব্যর্থ হয় যদিও ঈমানের দিক থেকে তারা কিছুটা দুর্বল কিংবা আপাত দৃষ্টিতে তাদেরকে ভালো মুসলিম বলে মনে হয় না। আল্লাহ মানুষের বিচার করেন তার মানবিক গুণাবলীর ভিত্তিতে এবং তার পুরস্কারও তদনুযায়ী নির্ধারণ করে থাকেন। অনুরূপভাবে সাধারণ মানুষও সে সব মহৎ ব্যক্তিদের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ প্রদর্শন করে ও স্বাগত জানায়।

গ. যে কোন ন্যায়সংগত ও সঠিক লক্ষ্য অর্জনের পদ্ধতি ও উপায়ও ন্যায়ানুগ ও সঠিক হওয়া চাই। যাঁরা ইসলামের আদর্শ অনুসরণ করেন তাঁদের প্রতিটি কাজের উদ্দেশ্য আইন সম্মত ও সত্যনিষ্ঠ হওয়া চাই। বৈধ কর্মের অনুশীলন তাঁদের অধিকারও বটে। পাশাপাশি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বৈধ ও ন্যায়নিষ্ঠ পন্থা অবলম্বন করা তাঁদের জন্য বাধ্যতামূলক। সততার সাথে গৃহীত সকল কাজ একমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে না হলে তাতে না অর্জন করা যায় আল্লাহর সন্তুষ্টি, না মোলাকাত লাভ করা যায় সত্যের। তাই ইসলামের সেবা কিংবা মুসলমানদের কোন ইপ্সিত লক্ষ্য হাসিল করতে হলে অবশ্যই তাদেরকে সাঠিক, সত্য ও বৈধ পথেই প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কোন বক্র, মিথ্যা ও অবৈধ উপায়ে তা হাসিল করা যাবে না।

কারো কারো কাছে এর বিপরীত পন্থাই সঠিক মনে হতে পারে। যারা নিজেদের মূল্যবোধ, বিশ্বাসযোগ্যতা ও মর্যাদা বিনা কারণে বেফজুল পথে ব্যয় করে আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিজেদের বঞ্চিত করেছে এবং পাশাপাশি জনসাধারণের আস্থা ও সমর্থন হারিয়ে ফেলেছে, মন্দ ও ভ্রান্ত পন্থায় তাদের পক্ষে কোন দীর্ঘস্থায়ী সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়।

পৃথিবীর উত্তরাধিকারীদের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, স্বাধীন ও মুক্ত চিন্তা ভাবনার ক্ষমতা (অর্জনকরা) এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। মুক্ত থাকা ও স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করার মধ্যে মানুষের ইচ্ছাশক্তির তেজস্বীতা নিহিত এবং এতে করে আত্মার রহস্য উদঘাটনের গোপন দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায়। ইচ্ছা শক্তির এ গভীরতা নির্ণয়ে যে অসমর্থ এবং রহস্যময় সে দরজা উন্মুক্ত করতে যে অপারগ সে প্রকৃত অর্থে 'মানুষ' পদবাচ্য হতে পারে না। সুদীর্ঘ সময় ধরে আমরা দাসত্বের ভয়ঙ্কর শৃংখলে অবদ্ধ থাকার কারণে আমাদের চিন্তা ও অনুভূতিতে জং ধরে গেছে। এর জন্য বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ নানা কারণ দায়ী। পঠন পাঠন, চিন্তা চেতনা, অনুভব অনুভূতি ও জীবন যাত্রার ওপর বিধি নিষেধের নানা খবরদারি যদি চেপে বসে তেমন এক পরিবেশে নবজাগৃতি ও উন্নতি অর্জন দূরের কথা সাধারণ মানবীয় গুণাবলী বজায় রাখাও সম্ভব হয় না। এমন পরিস্থিতিতে অনন্তের পানে চোখ মেলে থাকা নবজাগরণ ও পূণর্গঠনের ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের উত্থান দূরে থাক সাধারণ মানুষ হিসাবে ন্যূনতম চেতনার স্তর বজায় রাখাও সুকঠিন। এমতাবস্থায় সমাজে শুধুমাত্র দুর্বল চিত্তের মানুষেরই আধিক্য দেখা যায় যাদের ব্যক্তিত্ব পতনোন্মুখ, আত্মা নিষ্ক্রিয় ও অনুভূতি জরাগ্রস্ত।

নিকট অতীতে আমাদের মনে চিন্তার যে প্রবাহ গৃহ ও রাজপথ থেকে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কলা কেন্দ্র থেকে ঢেলে দেয়া হয়েছে তার সবগুলোই খণ্ডিত। একদেশদর্শী, নীতিবিচ্যুত ও ভ্রান্ত মানদণ্ড নির্ভর যা পার্থিব অপার্থিব এবং পদার্থ বিদ্যা থেকে অধিবিদ্যা পর্যন্ত সবকিছুকেই সমানতালে ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলেছে। ঐ সময়ে চিন্তাভাবনার নামে আমরা শুধুমাত্র নিজেদের বদ্ধ সংস্কারকেই প্রকাশ করেছি। যে কোন পরিকল্পনা গ্রহণের সময় আমরা কখনো আত্ম কেন্দ্রিকতার উর্ধে ওঠতে পারিনি। আমরা কখনো ভাবিনি যে, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর বাইরেও অন্য কোন মতামত থাকতে পারে। আমাদের বিশ্বাস ও বোধের বাইরেও নানাবিধ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থাকতে পারে। যখনই সুযোগ মিলেছে আমরা শক্তির স্বপক্ষে চলে গেছি। পাশবিক শক্তি প্রয়োগ করে ন্যায় ও স্বাধীনমতকে দলন করেছি। কারো না কারো ওপর আমরা সবসময় চড়াও হয়েছি। দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, আমরা এখনো জোর দিয়ে বলতে পারছিনা এ ধরণের ঘটনা এখন আর ঘটছে না কিংবা ভবিষ্যতে কোন দিন ঘটবে না।

যাহোক। এখন যেহেতু নবজাগরণের সূচনা আশা করছি, আমাদের জন্য জরুরী হয়ে পড়েছে বিগত হাজার বছরের ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি বিচার বিশ্লেষণ করা আর বিগত দেড়শ বছরে যে পরিবর্তন ও পরিমার্জন ঘটেছে তা খতিয়ে দেখা। এটা এ জন্যই জরুরী যে বর্তমানে বিচার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বিনা বাক্য ব্যয়ে গৃহীত কতিপয় গৎবাঁধা মানদন্ডের নিরিখে। কিছু দৃষ্টিভঙ্গী এমন আছে যার ভিত্তিতে নেয়া সিদ্ধান্ত ত্রুটি পূর্ণ ও অকার্যকর হয়ে পড়ে যা কোন ফলোদয় করেনা এবং অপেক্ষমান উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণেও ভূমিকা রাখেনা।

কাঙ্ক্ষিত সে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বিনির্মাণ যদি চলতি চিন্তাধারার নিরিখে গড়ে ওঠে তাহলে উচ্চাকাঙ্ক্ষার মারাত্মক জটাজালে আটকে পড়া জনসাধারণের মধ্যে লড়াই, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ, জাতি সমূহের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ ও বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্বই হবে অনিবার্য পরিণতি। এ কারণেই সমাজের একশ্রেণীর সাথে অন্য শ্রেণীর সংঘর্ষ ঘটছে, মতপার্থক্য যুদ্ধে রূপ নিচ্ছে, এ কারণেই সারা পৃথিবীতে সর্বাত্মক সন্ত্রাস, নৃশংসতা ও রক্তপাত ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষের অহংবোধ, লালসা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, নৃশংসতা তীব্র হয়ে না ওঠলে পৃথিবীর অবস্থা অবশ্যই অন্য রকম হত।

এ কারণেই, আমরা যখন ভিন্নতর এক পৃথিবীর কথা বলছি, নিজেদের ও অন্যদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে নূতনভাবে বিবেচনায় নিচ্ছি। আমাদেরকে অবশ্যই আরও অধিক মুক্ত চিন্তা ও মুক্ত ইচ্ছার অধিকারী হতে হবে। আমাদের মাঝে এমন সব মহৎপ্রাণ ও উদার হৃদয়ের অধিকারী মানুষের উত্থান ঘটাতে হবে যাঁরা অনায়াসে পক্ষপাতহীন মুক্ত চিন্তাকে সাদর সম্ভাষণ জানাতে সক্ষম হবেন। জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতি তাঁদের মন থাকবে উন্মুক্ত, যাঁরা জগত ও জীবনের বৃহত্তর ক্যানভাসে কুরআন ও সুন্নাতুল্লাহকে উপলব্ধি ও খাপ খাওয়াতে সক্ষম হবেন। অতীতে প্রতিভাধর মনিষীগণ এ সকল বৃহৎ কাজের আঞ্জাম দিয়েছেন। বর্তমানে তাঁদের সে মহৎ কাজের ভার নিতে হবে তাঁদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ এক নির্ধারিত গোষ্ঠীকে সম্মিলিতভাবে। এখনকার দিনে সব কিছুই হয়ে পড়েছে অবর্ণনীয়ভাবে বিস্তৃত, সুনিপুনভাবে বিশেষায়িত, সুনর্ধারিত, সুনির্দিষ্ট তালিকাভূক্ত ও রূপান্তরিত। তাই অনন্য ও অসাধারণ গুণাবলী সম্পন্ন প্রতিভাবানদের পক্ষেও সবকিছু সুসম্পন্ন করা

অসম্ভব। তাই ব্যক্তিগত প্রতিভাবানদের স্থান দখল করে নিয়েছে এখন যুথবদ্ধ চেতনাবোধ। যা যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শের ভিত্তিতে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। একে বলা হয় সামাজিক বিবেক। এই-ই হচ্ছে পৃথিবীর উত্তরাধিকারীগণের ষষ্ঠতম গুণাবলীর সার সংক্ষেপ।

এটা সত্য যে, ইসলামী সম্প্রদায়ের মধ্যে এ ধরণের বোধশক্তি নিকট অতীতে জাগরিত হয়নি। বস্তুত যুথচারী সচেতনতাবোধ, পরামর্শ ভিত্তিক যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, সম্মিলিত মানস ও বিবেকবোধ অবলম্বন করা তখন সম্ভব ছিলনা। কারণ আমাদের স্কুলগুলো ছিল বিশেষ কোন মতবাদের ধারক, কলেজগুলোতে চর্চা হতো জীবনের কৃত্রিমতাপূর্ণ কিছু ভাসমান দিক, দরবেশের কুটির ছিল অধিবিদ্যায় নিমগ্ন, সৈন্যদের ব্যারাকগুলো ছিল শক্তিমদমত্ততায় উন্মত্ত। সে সময় স্কুলগুলো ছিল সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন পন্ডিতদের করতলগত, তাঁদেরই নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে তাড়িত, কলেজগুলো ছিল উন্নয়ন সক্ষমতা বঞ্চিত বিজ্ঞান চিন্তার নিগড়ে বন্দী, মনে হত জীবন বুঝি এখানে এসে স্থবির হয়ে আছে। দরবেশের আস্তানাগুলো সকল উদ্দীপনা হারিয়ে ছিল অতীতে চিন্তায় মোহাচ্ছন্ন। ভুল বিশ্বাসের ব্যাধিতে আক্রান্ত ক্ষমতার প্রতিনিধিত্বকারী মানুষেরা মনে করত লোকজন বুঝি তাদের ভুলে আছে। তাই সার্বক্ষণিকভাবে তাদের দাপট ও ক্ষমতা প্রমাণ ও প্রদর্শনের মহড়া চালাত। ফলে সবকিছুতে একটা বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছিল এবং জাতিরূপ বৃক্ষ ছিল সদা প্রকম্পিত ও ভূমি থেকে প্রায় উৎপাটিত।

দূর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে, আমরা মনে করেছি জাতি ততদিন পর্যন্ত এ প্রকম্পন সহ্য করে যেতে পারবে যতদিন না কাঙ্ক্ষিত কতিপয় উপযুক্ত ব্যক্তি সঠিক স্থানে যথাযথ পদক্ষেপ নিয়ে মন ও হৃদয়ের মধ্যবর্তী পর্দা সরিয়ে দেবে। আর মানবতার দুর্বোধ্য মাত্রায় চিন্তা ও অনুপ্রেরণার একটি স্বতন্ত্র বলয় সৃষ্টি করবে।

পৃথিবীর উত্তরাধিকারীদের সপ্তম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গাণিতিক চিন্তাভাবনা। অতীতে এক সময় মধ্য এশিয়ায় ও পরবর্তীতে পাশ্চাত্যবাসীরা গাণিতিক চিন্তাভাবনা প্রক্রিয়ায় সমাজে রেনেসা সৃষ্টি করতে পেরেছিল। সংখ্যার রহস্যময় রাজ্যে মানুষ অনেক অনিশ্চিত ও অজানা বিষয় আবিষ্কার করতে এবং অনেক দুর্বোধ্য বিষয়েও আলোকপাত করতে সক্ষম হয়েছিল। হুরুফিদের মত চরমভাবাপন্ন না হয়েও আমরা বলতে পারি গণিত শাস্ত্রের সাহায্য ছাড়া আমরা মানুষ ও প্রকৃতির অন্যান্য বিষয় ও ঘটনার অন্তর্গত বিভিন্ন যোগসূত্র কখনো সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারব না। বিশ্বকেন্দ্র থেকে উৎসারিত জীবনের সঞ্চারপথে প্রক্ষিপ্ত আলোর মত তা আমাদের চলার পথে আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে। দিগন্ত রেখার বাইরের জগত সম্পর্কে তা আমাদের ইঙ্গিত দেয়, এমনকী অনিশ্চিত সম্ভাবনার যে জগত সম্পর্কে ধারণা করা খুবই কঠিন সে জগতের গভীরতার সন্ধানও দেয় গণিত। এবং এটা আমাদের ভাবাদর্শের সাথে আমাদের সম্মিলন ঘটায়।

এর মানে এ নয় আমাদেরকে গণিতশাস্ত্রের সাথে সম্পর্কিত সব কিছু অনুপুঙ্খ জেনে নিতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে গাণিতিক পদ্ধতিতে, গাণিতিক নিয়মের সীমারেখার মধ্যে চিন্তাভাবনা করা। আমাদের মনে রাখতে হবে মানুষের চিন্তাধারা থেকে শুরু করে অস্তিত্বের সুগভীর তলদেশ পর্যন্ত, পদার্থ বিদ্যা থেকে অধিবিদ্যা, বস্তু থেকে শক্তি, দেহ থেকে আত্মা, আইন থেকে সূফিবাদ সবকিছুতেই গণিতের সূত্রধারা প্রবাহিত। অস্তিত্বের গূঢ়তত্ত্ব পরিপূর্ণরূপে বুঝতে চাইলে আমাদিগকে দ্বিবিধ পদ্ধতি– সূফি পদ্ধতি ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি উভয়টি অবলম্বন করতে হবে। পাশ্চাত্য অনিবার্যভাবে জীবনের মূল রসকে শুষ্ক করে ফেলেছে, এ ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সে ঝুঁকে পড়েছে রহস্যবাদের দিকে। কিন্তু আমাদের জগত, যা ইসলামের প্রাণরসে সর্বদা সঞ্জীবিত, তার পক্ষে অন্য কোন আনকোরা তত্ত্ব বা বিদেশী মতবাদে আশ্রয় খোঁজার প্রয়োজন নেই। আমাদের ভাবনা ও ঈমানের সরোবরে সকল শক্তির উৎস নিহিত। এই শক্তির উৎস ও চেতনার মৌলিক সৌন্দর্য ও প্রাচুর্যকে যদি আমরা যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারি তবে তাই হবে আমাদের জন্য যথেষ্ট। তাহলে আমরা সৃষ্টির মধ্যে কিছু রহস্যপূর্ণ সম্পর্ককে আবিষ্কার করতে সক্ষম হব, এ রহস্যময়তার মধ্যে রয়েছে একটি নিবিড় ঐক্য। তখনই পর্যবেক্ষণের এক ভিন্নতর জ্ঞানমালা আমাদের রপ্ত হবে আর তখন সব কিছুতেই আমরা খুঁজে পাব আনন্দের উপকরণ।

গাণিতিক চিন্তাধারা সম্পর্কে এটি একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র। অনেকের কাছে এ আলোচনাকে শূণ্যগর্ভ কিংবা কতিপয় শব্দরাশির অপচয় মাত্র মনে হতে পারে। কিন্তু আমার বিশ্বাস অদূর ভবিষ্যতে আমাদের জীবনে ঝংকৃত হতে থাকবে এর সুরেলা সিম্ফনী।

অষ্টম বৈশিষ্ট্য হিসাবে আমাদের থাকতে হবে শিল্পের বোধ। অবশ্য সাম্প্রতিক সময়ের কতিপয় বিশেষ বিষয়কে বিবেচনায় রেখে আমি বলতে চাই, "আমাদের আদর্শের মানদন্ডে এ পথে যাত্রা করার জন্য কোন কোন গোষ্ঠী এখনো প্রস্তুত নয়, সাময়িকভাবে আমরা তা অনাগত ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি।"

মাশুকের দিদার লাভের পথ

● আবু মোহাম্মদ জাফরুল হক ●

পূর্বপ্রকাশিতের পরঃ

যেখানে হযরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহুর মত একজন মহাজ্ঞানী একটি অতি ক্ষুদ্র সূরার তফসির করিতেও সাহস করেন নাই, সেখানে আজকাল প্রায় সকলেই তাহা করিতে পারেন! সকল লোকের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যাঁহারা মাদ্‌রাসা হইতে কোন রকমে একবার ইজার কোরতা-পাগড়ি পরিধানের অধিকারটা আদায় করিয়া লইতে পারিলেই হইল, ব্যস এই হেকমতের ভান্ডার তাঁহাদের নিকট জলবৎ তরলং হইয়া যায়। সম্ভবতঃ এই কারণেই অধুনা হাটে-বাজারে কোরআনের তফসিরের এত ছড়াছড়ি। আফসোসের বিষয় এই সকল তফসিরের প্রায়গুলিরই ভাষান্তরগত ত্রুটির তো কথাই নাই, ব্যাখ্যাতেও একটির সংগে অপরটির মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আর এই ভাবে তাঁহারা প্রকারান্তরে বিশ্বের এই শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থখানির মর্যাদা ক্ষুণ্ন করিয়া চলিয়াছেন। যাঁহারা এ ব্যাপারে উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের জানিয়া রাখা উচিত যে সাধারণ মানবের পক্ষে কোরআনের তফসির করা সম্ভব হইবে না বলিয়াই কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর সাথেসাথেই উহার তফসিরও করা হইয়া গিয়াছে। সেজন্যই হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহু কোরআনের তফসির করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই।

একদা হযরত বেলাল রাদিআল্লাহু আনহু হজরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলেন–উম্মুল মোমেনিন, আমাদের হজরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের স্বভাব-চরিত্র কিরূপ ছিল? তিনি জানিতে চাহিলেন- তুমি কি কোরআন পাঠ কর না? তিনি উত্তর করিলেন– জ্বি আম্মা পাঠ করি। হজরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বলিলেন– কা'না খুলুকু রাসুলুল্লাহেল কোরআনু–হজরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের চরিত্রই কোরআন।

বস্তুতঃ জগতের সকল মহাপুরুষই হজরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ করিয়া কোরআনের ব্যাখ্যা পাইয়াছেন– সকল সমস্যার সমাধান পাইয়াছেন– জীবনের অর্থ খুঁজিয়া পাইয়াছেন– মানুষ রাস্তা পাইয়াছেন। কিন্তু হাল জামানার মুসলমানগণ তাঁহার পদাংক অনুসরণের পরিবর্তে আখেরি চাহার সোম্‌বা ইদ-ই-মিলাদুন্নবী ইত্যাদি বিশেষ দিবস উপলক্ষে এবং ঠেকা-বেঠেকায় মিলাদ মাহফিলের আয়োজনের মাধ্যমে নাম–কা–ওয়াস্তে তাঁহাকে স্মরণ করিয়াই কর্তব্য শেষ করিতেছেন।

যে কোন ওয়াজ–মজলিশ, মিলাদ মাহফিল, তবলিগের জামাত ইত্যাদিতে গেলে দেখা যায় যে প্রায় সকলেই হজরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্য কাঁদিয়া দাঁড়ি ভিজাইয়া ফেলিতেছে। বাস্তবে তাহাদের কেহ এতিম, বিধবা এবং দরিদ্র-কে ভালবাসে না, মুসাফিরকে আশ্রয় দেয় না, দস্তরখানে প্রতিবেশীকে শরীক করে না, তালি দেওয়া বস্ত্র পরিধান করে না, অধীনস্থদের সংগে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া শ্রমে অংশগ্রহণ করে না, উদরে পাথর বাঁধে না, হরিণ শাবকদের অসহায় অবস্থা স্মরণ করিয়া হরিণীকে মুক্ত করিবার জন্য শিকারীর নিকট বাঁধা যায় না, পথের বিঘ্ন অপসারণ করে না। ফলে কোরআনও তাহাদের দিকে হেকমতের দুয়ার উন্মুক্ত করে না। এইসব কারণেই এই মহাবিজ্ঞানময় কোরআন অধুনা মুসলিম সমাজে তাৎপর্যহীন হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহা সুদৃশ্য চর্মের আবরণে আবদ্ধ হইয়া কেবলমাত্র তাকের শোভাই বর্ধন করিতেছে। মুসলমানদের এই অধঃপতন লক্ষ্য করিয়াই হযরত মাওলানা জালালউদ্দিন রুমী রহমতুল্লাহ আলাইহে বলিয়াছেন,

মানজে কোরআঁ মগ্‌জে হা বরদাশতম
ওসতুখাঁ পেশ-এ ছাগা আনদাখতম-

আমি কোরআন হইতে তাহার সারাংশ আহরণ করিয়া লইয়াছি আর তাহার হাড়গুলি দুনিয়ার কুকুরদের সামনে ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছি। (তাহারা উহা লইয়া কামড়া কামড়ি করিতে থাকুক)।

বাদশাহ্ নামদার, প্রায় সকলেই মহা উৎসাহে বলিয়া থাকে যে ইসলাম মানবতার ধর্ম। কার্যতঃ প্রায় সকলেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অমানবিক তৎপরতায় লিপ্ত রহিয়াছে। আপনি মুসলিম দেশগুলির প্রতি তাকাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে কেবল গুটিকতক দেশ ব্যতীত বাকি সকল দেশেরই সাধারণ নাগরিক আজ মানবেতর জীবন যাপন করিতেছে। সকল দেশেরই নেতৃত্ব আজ বিধর্মীদের লেজুড় হইয়া ঝুলিতেছে। অথচ এই জাগ্রত বীর জাতিকেই সমগ্র পৃথিবীর নেতৃত্ব দিবার কথা, সমগ্র পৃথিবীকে মানবতা শিক্ষা দিবার কথা, সমগ্র পৃথিবীকে

শান্তির আগারে পরিণত করিবার কথা, সমগ্র পৃথিবীকে ইনসাফ শিখাইবার কথা, সমগ্র পৃথিবীকে ভালোবাসা শিখাইবার কথা। কিন্তু কেন এইরূপ হইয়াছে? ইহার উত্তরে বলা যায়, যে-দুইটি বস্তু ছিল সকল কল্যাণের উৎস উমাইয়া খেলাফতের আমল হইতেই তাহা মুসলমানদের হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে।

হযরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁহার বিদায় হজের ভাষণে বলিয়াছেন, আমি তোমাদের নিকট দুইট দ্রব্য রাখিয়া যাইতেছি, যতদিন পর্যন্ত এই দুইটি দ্রব্য তোমরা মজবুতভাবে ধরিয়া রাখিবে, তোমরা পথভ্রষ্ট হইবে না। উহাদের একটি আল্লার কোরআন, অপরটি তাঁহার রাসুলের আচরণ এবং জীবন পদ্ধতি। – আবু দাউদ

একদা একব্যক্তি হযরত ইবরাহিম ইবনে আদহাম রহমতুল্লাহ আলাইহের নিকট জানিতে চাহিল হুজুর মুসলমানি কি এবং মুসলমান কে? তিনি বলিলেন, মুসলমানি কিতাবে আর মুসলমান কবরে।

হে ইসলামী ঐতিহ্যের ধ্বজাধারী বাদশাহ্, এককালে এই কিতাবের ইসলামের আলোকে সমগ্র বিশ্ব আলোকিত হইয়া গিয়াছিল। এক কালে এই কবরের মুসলমানের প্রেমের বন্যায় সমগ্র বিশ্ব প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। এককালে এই কবরের মুসলমানের ত্যাগের মহিমায় সমগ্র বিশ্ব হতবাক হইয়া গিয়াছিল। এককালে এই কবরের মুসলমানদের বদান্যতা, ইনসাফ, এলেম ও বীরত্বে সমগ্র বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছিল। অথচ এই ইসলামের কোন সুসজ্জিত সেনাবাহিনী ছিল না, রাজকোষ ছিল না, অস্ত্রাগার ছিল না, পাঁচ হাজারি দশ হাজারি মনসবদার পরিবেষ্টিত মসনদ ছিল না, শাসনকর্তার দেহরক্ষী ছিল না।

এই কবরের মুসলমানদের মাথার উপর কোন ছাদ ছিল না। দিবারাত্রির মধ্যে পেটে দেওয়ার জন্য একটি খোরমার সংস্থান ছিল না। আবরু রক্ষার জন্য পরিমিত বস্ত্র ছিল না। ইহা সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণ করিয়া দারিদ্র্য-জীবন যাপন করিবার জন্য, ইসলামের উদ্দেশ্যে তলোয়ারের নিচে শির দিবার জন্য, ক্ষুধায় কাতর হইয়া পাথর চুষিবার জন্য, বস্ত্রাভাবে শীতে-গ্রীষ্মে কষ্ট করিবার জন্য দুনিয়ার প্রায় সকল জাতির সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে তুমুল হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। কে কাহার আগে ইসলামে প্রবেশ করিবে তাহা লইয়া তাহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হইয়া গিয়াছিল।

এই নূতন ধর্মের হাল-হকিকত ওয়াকিফহাল হওয়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশ হইতে রাজপ্রতিনিধি এবং ইহুদী, মাজুসি ও খৃষ্টান পন্ডিতবর্গ আসিয়া দেখিতেন, সর্বজন মান্য দানবীর হযরত আবুবকর রাদিআল্লাহু আনহু কাটা কাপড়ের গাঠুরি মাথায় করিয়া বাজারে বাজারে ফেরি করিয়া ফিরিতেছেন। জগদ্বিখ্যাত ন্যায়বিচারক হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু হাতের উপর শির রক্ষা করিয়া উন্মুক্ত মাঠে নিদ্রা যাইতেছেন। প্রখ্যাত ধনপতি হযরত ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহু আনহু বাবুল কাঁটা দ্বারা শতছিন্ন জামা রিপু করিতেছেন। মহাজ্ঞানী হযরত আলী করমুল্লাহু ওয়াজহু এ মুষ্টি যবের জন্য বিদেশ হইতে বাণিজ্য সম্ভার লইয়া আগত উটের পৃষ্ঠ হইতে বোঝা নামাইতে নামাইতে ক্ষুধা ও ক্লান্তিতে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা আরও দেখিতেন, এই মহাজাতির মহানায়কের পোষাক ও আচরণে আলাদা কোন পরিচয় নাই। তিনি সকলের সংগে একযোগে কাজ করেন, এক বস্ত্রে দিন কাটান, গরীবের প্রয়োজনে সর্বাগ্রে সাড়া দেন।

এইসকল বিদেশী আসিবার সময় সংগে পরিপূর্ণ দুনিয়া লইয়া আসিতেন, যাইবার সময় সব ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া আত্মার পরিচয় জ্ঞাত হইয়া চলিয়া যাইতেন। কিন্তু বাদশাহ্ নামদার, এই অপূর্ব গৃহখানি দুনিয়ার বুকে মাত্র চল্লিশটি বৎসরের অধিককাল স্থায়ী হইতে পারে নাই।

হযরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার পর ইসলাম তিরিশ বছর জীবিত থাকিবে। তিরমিজি, আবু দাউদ

তাঁহার ভবিষ্যৎ বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গিয়াছিল। খোলাফায়ে রা'শেদিনের যুগাবসানের পর মুসলমানগণই ইসলামকে কারবালা প্রান্তরে লইয়া গিয়া প্রবৃত্তির সুধার খঞ্জরের আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিল।

হে তথ্যানুসন্ধানী বাদশাহ্, জনশ্রুতি রহিয়াছে যে কারবালা প্রান্তরে এখনো নাকি 'হায় হোসেন হায় হোসেন' মাতমমজারি শুনিতে পাওয়া যায়। যদি কোনদিন সেই বধ্যভূমিতে আপনার যাওয়ার সুযোগ হয় এবং আপনি হযরত ইমাম হোসেন রাদিআল্লাহু আনহুর সমাধি মন্দিরের পাদপীঠে দাঁড়াইয়া জনশ্রুতিটি যাচাই করিয়া দেখিতে মনস্থ করেন, আমি নিশ্চয়ই করিয়া বলিতে পারি তখন আপনি যাহা শুনিবেন, তাহা 'হায় হোসেন হায় হোসেন' নহে তাহা 'হায় ইসলাম হায় ইসলাম'। এই করুণ আর্তনাদ আজ শুধু কারবালাতেই সীমাবদ্ধ নাই, তাহা তথাকথিত সমগ্র মুসলিম জাহানের আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

লেখকের "জীবনের অন্য রূপ" গ্রন্থ থেকে।

ইমাম আবুল হাসান সারি বিন মুগাল্লিস আস্ সাক্বাতি আল বাগদাদী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

● মুহাম্মদ রবিউল আলম ●

শরিয়ত, তরিক্বত, মারিফাত এবং হাকিক্বতের মধ্যে যে সকল আউলিয়ায়ে কিরামের পরিপূর্ণ বিচরণ ছিল তাঁদের অন্যতম হলেন ইমাম আবুল হাসান সারি বিন মুগাল্লিস সাক্বাতি আল বাগদাদি রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। তিনি ছিলেন আলিম বাআমল, মুহাদ্দিছ, প্রখ্যাত সূফি এবং কাদেরিয়া, মাইজভাণ্ডারীয়া, মুজাদ্দেদিয়া, উলাইয়া ইত্যাদি তরিকার উর্ধ্বতন শাইখ।

জন্ম ও পরিচিতিঃ ইমাম সারি সাক্বাতি ইরাকের বাগদাদ নগরীতে ১৬০ হিজরীর কোন এক সময়ে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম তারিখ জানা নেই। তাঁর নামঃ সারি, উপনামঃ আবুল হাসান, উপাধিঃ সাক্বাতি। তাঁর পিতার নাম মুগাল্লিস। উপমহাদেশে তাঁকে 'সিররি সাক্বতি' বলা হয়, যা মূলত ভুল। তাঁর উপাধি 'সাক্বাতি' হবার কারণ সম্পর্কে শেখ ফরিদুদ্দিন আত্তার আলাইহির রাহমাহ বলেন, তিনি গাছ থেকে পতিত ফল কুড়িয়ে বিক্রি করতেন বলে তাঁকে 'সাক্বাতি' বলা হয়। আধ্যাত্মিক পথ অবলম্বনের পূর্বে তিনি এ কাজ করতেন। কারণ ইমাম যাহাবী, ইমাম ইবনু জাওযী, ইমাম আবু নয়ীম ইসপাহানীর মত নির্ভর যোগ্য ইতিহাসবিদদের সূত্রে জানা যায় যে, তিনি ব্যবসা করতেন।

শিক্ষা জীবনঃ তাঁর শিক্ষা জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত কোন তথ্য পাওয়া যায় না; তবে তিনি যে একজন জ্ঞানানুরাগী ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি ইলমুল হাদিস এবং ইলমুত তাসাওউফ অর্জন করে ছিলেন। তিনি অনেক মুহাদ্দিস থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

শিক্ষক বৃন্দঃ ইমাম যাহাবী এবং ইমাম আবু নয়ীম ইস্পাহানীর মতে, তিনি ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ইনা, ইমাম হুশাইম, হযরত ফুদাইল বিন আয়ায, হযরত মুহাম্মদ বিন ফুদাইল, হযরত মারওয়ান বিন মুয়াবিয়া হযরত আবু বকর বিন আইয়াশ, হযরত আলী বিন গুরাব, হযরত ইয়াযীদ বিন হারুন প্রমুখ ছিলেন ইমাম সারি সাক্বাতির উল্লেখযোগ্য শিক্ষক। এরা ছিলেন ইলমে হাদিসের শিক্ষক। তাঁর তরিকতের শাইখ হচ্ছেন ইমাম মারুফ কারখী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। এছাড়াও তিনি হযরত হাবিব রাই আলাইহির রাহমাহ থেকেও ফয়েজ লাভ করেছেন।

শিষ্যবৃন্দঃ ইমাম সারি সাক্বাতি রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছিলেন ইলমে যাহেরী আর ইলমে বাতেনীর ধারক-বাহক। তাই তাঁর থেকে অসংখ্য ছাত্র উভয় জ্ঞান অর্জন করেছেন। তন্মধ্যে তাঁর ভাগ্নে ইমাম জুনাইদ বাগদাদী, হযরত আবুল হুসাইন নূরী, হযরত আবুল আব্বাস বিন মাসরূক্ব, হযরত ইবরাহীম বিন আব্দুল্লাহ মুখাররামী, হযরত আব্দুল্লাহ বিন শাকির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম প্রমুখ।

কর্ম জীবনঃ তাঁর কর্ম জীবনের দু'টি অংশ রয়েছে। প্রথমাংশে তিনি ব্যবসা করতেন। বাজারে তাঁর একটি দোকান ছিল। বিভিন্ন ঘটনা থেকে জানা যায় যে, তিনি ফল, কাপড় আর মুদির দ্রব্যাদি বিক্রি করতেন। সম্ভবত তিনি প্রথমে ফলের, তারপর কাপড়, অতঃপর মুদির দোকান করতেন। বাজারে আগুন লেগে সকল দোকান জ্বলে গেল, কিন্তু তাঁর দোকান নিরাপদ রইল। এরপর তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন আর দোকানের যাবতীয় মাল সদক্বা করে দিলেন। দ্বিতীয়াংশে তিনি ইলমে তাসাওউফের ধারক, বাহক হয়ে আল্লাহর প্রেমে মশগুল হয়ে রিয়াযত বন্দেগীতে বাকী জীবন অতিবাহিত করেছেন।

তাসাওউফ ও বেলায়ত অর্জনঃ ইমাম সারি সাক্বাতি রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পাশ দিয়ে একজন দাসী অতিক্রম কালে তার হাত থেকে পড়ে একটি পাত্র ভেঙ্গে গিয়েছিল। দাসীর হাত থেকে পড়ে পাত্রটি ভেঙ্গে যেতে দেখে ইমাম সারি সাক্বাতি তাঁর দোকান থেকে আরেকটি নতুন পাত্র ঐ দাসীকে দিলেন। এ ঘটনা ইমাম মারুফ কারখী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দেখে তাঁর জন্য দোয়া করে বললেন, 'আল্লাহ ইহজগতকে তোমার নিকট অপ্রিয় করে দিক।' এ দোয়ার পরেই তিনি তাঁর দোকান সদক্বা করে দিলেন এবং ইমাম মারুফ কারখী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মজলিসে উপস্থিত হয়ে তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক পথে পা রাখেন। ইমাম সারি সাক্বাতি রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, فهذا الذى انا فيه من بركات معروف 'ইমাম মারুফ কারখী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর দোয়ার বরকতেই আমি এ পর্যন্ত এসেছি।'

খোদাভীতিঃ আল্লাহ তা'আলাকে যারা যত বেশি চিনবে, তারা তত বেশি তাঁকে ভয় করবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, انما يخشى الله من عباده العلماء 'আল্লাহর বান্দার মধ্যে আলেমগণই তাঁকে ভয় করে।' কারণ তারা আল্লাহকে অন্যদের চেয়ে বেশি চেনে। আউলিয়া এবং সূফিয়ায়ে কিরামগণ তো আল্লাহর মারিফাত অর্জনে সদা মশগুল থাকেন আর মারিফাত অর্জনের কারণেই তাঁরা আল্লাহকে

অধিক ভয় পান। ইমাম সারি সাক্বাতি রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আল্লাহকে অত্যাধিক ভয় করতেন। তিনি দিনে কয়েকবার আয়নায় স্বীয় চেহারা দেখতেন। বারবার আয়নায় চেহারা দেখার কারণ জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, গুনাহর কারণে আল্লাহ আমার চেহারা কাল করে দিয়েছেন কিনা তা দেখি।

প্রবৃত্তির বিরোধিতা: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, প্রকৃত মুজাহিদ তিনি, যিনি স্বীয় প্রবৃত্তির সাথে যুদ্ধ করেন। এ হাদিসের ওপর আমল করেন সূফি-সাধকগণ। নফসের সাথে তথা প্রবৃত্তির সাথে যুদ্ধ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। আল্লাহর রহমতে আর উপযুক্ত পীরের সান্নিধ্যে এ কাজে সফল হওয়া যায়। ইমাম সারি সাক্বাতি রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে ইমাম জুনাইদ বাগদাদী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন। ইমাম জুনাইদ বাগদাদী বলেন, আমি আমার মামা এবং পীর ইমাম সারি সাক্বাতির নিকট গিয়ে দেখলাম যে, তাঁর সামনে একটি ভাঙ্গা পাত্র আর তিনি বসে বসে কাঁদছেন। আমি তাঁকে কাঁদার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বলেন, আমি রোজা রেখেছি। আমার ইফতারের জন্য আমার মেয়ে ঠান্ডা পানির একটি পাত্র এখানে এনে রাখল। অতঃপর আমার একটু ঘুম চলে আসলে আমি স্বপ্নে দেখি যে, এ দরজা দিয়ে সুন্দর জুতা আর রূপার কামিছ পরিহিতা একটি অত্যন্ত সুন্দর দাসী আমার কক্ষে প্রবেশ করল আর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কার জন্য? সে বলল, আমি ঐ ব্যক্তির জন্য, যিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় ঠান্ডা পানি পাত্রে রাখেননা এবং দানও করেননা। তারপর সে স্বীয় পা বা জামার হাতা দিয়ে ঐ পাত্রটি মাটিতে ফেলে দিয়ে ভেঙ্গে ফেলে। অতঃপর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল আর দেখতে পেলাম যে, পাত্রটি বাস্তবেই মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে রয়েছে। ইমাম জুনাইদ বাগদাদী রাদ্বিয়াল্লাহু আ'আলা আনহু বলেন, ইমাম সারি সাক্বাতি ত্রিশ বছর যাবত তাঁর প্রবৃত্তির সাথে যুদ্ধ করেছেন। তাঁর প্রবৃত্তির ত্রিশ বছর মতান্তরে চল্লিশ বছরেও তাঁর ইচ্ছা পূরণ করেননি। এভাবে তিনি সর্বদা প্রবৃত্তির বিরোধিতা করতেন।

ইবাদত-বন্দেগী: ইমাম সারি সাক্বাতির একনিষ্ঠ মুরীদ ও খাদেম ইমাম জুনাইদ বাগদাদী। তিনি সর্বদা তাঁর সেবা করতেন। তিনি বলেন, ওফাতকালীন অসুস্থতা ছাড়া আটান্নব্বই বছর পর্যন্ত আমি ইমাম সারি সাক্বাতিকে বিছানায় পিঠ লাগিয়ে ঘুমাতে দেখিনি। ইমাম সারি সাক্বাতি রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, 'আমার নিয়মিত অযিফা বা আমলের সামান্য অংশ কোন সময় পড়তে না পারলে তা পরবর্তীতে অন্য কোন সময় কাযা করার সুযোগ হয়না।' কারণ অন্য সকল সময়ে তিনি অন্যান্য ইবাদতে মশগুল থাকেন। এ থেকে বুঝা গেল যে, তিনি সদা আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন।

খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে পরহিজগারিতা: তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে খাবার গ্রহণ করতেন। তিনি কখনো সন্দেহযুক্ত খাবার গ্রহণ করতেন না। এ বিষয়ে তাঁর থেকে কয়েকটি ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। তন্মধ্য থেকে দুটি ঘটনা উল্লেখ করা হল। এক. ইমাম সারি সাক্বাতি ব্যবসা করতেন। তিনি দোকান সদকা করে ব্যবসা ছেড়ে দেয়ার পর থেকে তাঁর বোন তাঁর খরচ বহন করতেন। তাঁর বোন তুলার ব্যবসা করতেন। তিনি প্রতিদিন নিয়মিত তাঁর ভাই সারি সাক্বাতির খানা-পিনা পরিবেশন করতেন। কোন একদিন তাঁর খানা-পিনা পরিবেশন করতে বিলম্ব হলে ইমাম সারি সাক্বাতি জিজ্ঞেস করলেন আজ কেন বিলম্ব হল? সে বলল আজ আমার বুনা তুলা বিক্রি হয়নি। ইমাম সারি সাক্বাতি খোঁজ নিল যে, কেন তার তুলা বিক্রি হয়নি। তিনি জানতে পারলেন যে, তাঁর বোন সেদিন মিশ্রিত তথা ভেজাল তুলা বিক্রি করতে চেয়েছে। এরপর থেকে তিনি না তাঁর বোন থেকে খরচ নেন, না তাঁর খাবার গ্রহণ করেন। তিনি বলতেন, আমি এমন খাবার পছন্দ করি, যার মধ্যে কোন মানুষের করুণা নেই এবং যার কারণে আল্লাহ আমাকে শাস্তি দিবেন না।

দুই. ইমাম জুনাইদ বাগদাদী থেকে বর্ণিত। ইমাম সারি সাক্বাতি বললেন, 'আমরা একদা মক্কা শরীফ থেকে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমরা একটি মরুভূমিতে পৌঁছার পর দেখতে পেলাম যে, সেখানে একটি প্রবাহিত নদী বা খাল রয়েছে আর এ নদীর ওপর দিয়ে কিছু সবজি ভেসে আসছে। আমি হাত বাড়িয়ে এগুলো নিলাম আর আল্লাহর প্রশংসা করলাম। কারণ আমার জানা মতে এগুলো এমন বৈধ খাদ্য যার মধ্যে কোন সৃষ্টি জীবের করুণা নেই। অতঃপর আমার কতিপয় সঙ্গী বলল, হুযুর! ঐখানে আরো সবজি দেখা যাচ্ছে, সেগুলো নিন। আমি (সারি সাক্বাতি) বলেছি যে, প্রথমে যেগুলো নিয়েছি তার মধ্যে কারো অনুগ্রহ ছিল না, কিন্তু যেগুলো আমাকে দেখিয়ে দিলে সেগুলোর মধ্যে তোমাদের অনুগ্রহ নিহিত অথচ আমি চাই এমন বৈধ খাবার যার মধ্যে কারো অনুগ্রহ নেই।

সততা: সততা একটি মহৎ গুণ। ব্যবসা-বাণিজ্যে এ গুলোর উপস্থিতি অপরিহার্য। ইমাম সারিসাক্বাতি রাদ্বিয়াল্লাহু

তা'আলা আনহু ব্যবসা করতেন, অত্যন্ত সততার সাথে তিনি কখনো কাউকে ঠকাতেন না; বরং অপরের কল্যাণ কামনা করতেন। তিনি সামান্য লাভ করতেন। একদা তিনি একটি বাদামের বস্তা ক্রয় করলেন ষাট দিনার দিয়ে এবং বিক্রি করবেন ৬৩ দিনার দিয়ে এক দালাল এসে কিছুদিন পর বলল, এ বাদামের বস্তার দাম কত? তিনি বললেন, ৬৩ দিনার। দালাল বলল এ বাদামের বর্তমান বাজার মূল্য ৯০ দিনার; কিন্তু আপনি এত কম দামে বিক্রি করছেন কেন? তিনি বললেন, কারণ যা আমি বলেছি তা-ই হবে। কেননা এতে কারো ক্ষতি হবে না।

নির্জনতা: তিনি নির্জনতা পছন্দ করতেন। কারণ নির্জনে ইবাদত করার মধ্যে মনোনিবেশ ঠিক থাকে। তিনি জামাতে নামায আদায়ের জন্য বের হলে মানুষ তাঁর সাক্ষাতের জন্য ভিড় করত। ইমাম সারি সাক্বাতি রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, নামাজ পড়ার জন্য ঘর থেকে বের হবার পর মানুষ আমার সাক্ষাতের জন্য ভিড় করবে-এ কথা স্মরণ হবার পর আমি আল্লাহর দরবারে দোয়া করি, হে আল্লাহ! যারা আমার নিকট আসতে চায় তাদেরকে আপনি এমন ইবাদত করার সুযোগ দিন যাতে তারা ইবাদতের স্বাদ পেয়ে আমার নিকট আর না আসে। হযরত আলী বিন আব্দুল হামীদ আলাইহির রাহমাহ বলেন, 'আমি একদিন তাঁর বাসায় গিয়ে দরজা নাড়া দিলাম। তিনি ভিতর থেকে বললেন, হে আল্লাহ! যে আমাকে তোমার স্মরণ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে, তুমি তাকে তোমার ইবাদতে মশগুল করে দাও। এ দোয়ার পর আমি চল্লিশ বার হজ্ব করেছি।

ধৈর্য্যশীলতা: তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্য্যশীল। তিনি বলেন, জমিনের মত ধৈর্য্যশীল হতে হবে। জমিন যেমন বিরাট বিরাট পাহাড়রাজি আর মানব জাতিসহ অসংখ্য সৃষ্টি জীবনের ভার বহন করছে, তদ্রুপ মানুষকে ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে। ধৈর্য্যের পরিচয় প্রদানকালে একটি বিষাক্ত বিচ্ছু তাঁর শরীরে বারবার দংশন করছে অথচ তিনি এটিকে দেখেও ফেলে দিলেন না। এর কারণ জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, আমি লজ্জা অনুভব করলাম। কারণ আমি ধৈর্য্য ধারণের কথা বলছি। মূলত একে তাড়ালেও এটি ধৈর্য্যশীলতার বিরোধী হত না।

উলামায়ে কিরামের মন্তব্য: তাবেয়ী যুগের ইমাম সারি সাক্বাতি রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছিলেন নিঃসন্দেহে একজন বড় মাপের অলি ও সূফি। তাঁর সম্পর্কে সূফিয়ায়ে কিরামের অসংখ্য প্রশংসাসূচক বাক্য পাওয়া যায়। তা থেকে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১. ইমাম শারানী আলাইহির রাহমাহ বলেন, 'ইমাম সারি সাক্বাতি রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাকওয়া-পরহিজগারিতা এবং ইলমে তাওহীদের ক্ষেত্রে ছিলেন স্বীয় যুগে অদ্বিতীয়।'

২. ইমাম আব্দুর রহমান সুলমী আলাইহির রাহমাহ বলেন, 'বাগদাদে তিনিই সর্ব প্রথম ইলমে তাওহীদ এবং ইলমে হাক্বিকতের কথা বলেন। তিনি ছিলেন স্বীয়কালে বাগদাদবাসীদের ইমাম এবং পীর।'

৩. আল্লামা ইবনুল ইমাদ আলাইহির রাহমাহ বলেন, 'বড় বড় অলিগণের মধ্যে তিনিও একজন।'

৪. আল্লামা ইবনু খল্লিকান আলাইহির রাহমাহ বলেন 'তিনি ছিলেন তরিকত ও হাক্বিকতের ধারক-বাহক আর তাঁর সময়ে ইলমে তাওহীদ ও পরহিজগারিতায় অদ্বিতীয় ছিলেন।'

৫. ইমাম যাহাবী বলেন, 'তিনি ছিলেন ইমাম, সূফি, মুহাদ্দিস এবং স্বীয় যমানায় আউলিয়ায়ে কিরামের আদর্শ।'

৬. ইমাম জুনাইদ বাগদাদী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, 'আমি ইমাম সারি সাক্বাতি রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র চেয়ে অধিক ইবাদতকারী আর কাউকে দেখিনি।'

বাণী সমূহ: তাঁর অসংখ্য বাণী পাওয়া যায়। তন্মধ্য থেকে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হল। তিনি বলেন,

১. চারটি গুণ মানুষের মর্যদা বৃদ্ধি করে। এ গুলো হল: জ্ঞান, শিষ্টাচার, ক্ষমাশীলতা এবং আমানতদারি।

২. দুনিয়ার ওপর নির্ভরশীল হয়োনা। কারণ তোমার রশি আল্লাহর নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। জমিনের ওপর অহংকার করে হেঁটো না; কারণ তার সামান্য অংশে তোমার কবর হবে।

৩. আমলকে বিপদমুক্ত করা আমল করার চেয়ে কঠিন।

৪. জান্নাতে যাবার সংক্ষিপ্ত রাস্তা হচ্ছে, কারো থেকে কিছু গ্রহণ না করা, কারো কাছে কিছু না চাওয়া আর অন্যকে দেয়ার মত কিছু না থাকা।

৫. ইহকালের পাঁচটি বস্তু ব্যতীত সব কিছু অপ্রয়োজনীয়। এগুলো হল, ১. ক্ষুধা নিবারণের জন্য রুটি ২. পান করার পানি ৩. লজ্জাস্থান ঢাকার জন্য কাপড় ৪. থাকার জন্য ঘর এবং ৫. আমলের জন্য ইলম।

৬. যে ব্যক্তি আল্লাহর স্মরণে লিপ্ত থাকে আল্লাহর স্মরণের স্বাদ শয়তানের মন্ত্রণাকে তার নিকট তিক্ত করে দেয়।

৭. যে ব্যক্তি ইহকালে সময় ক্ষেপণ করবে, কিয়ামত দিবসে তার পেরেশানী দীর্ঘায়িত হবে।

৮. যে ব্যক্তি নিয়ামতের মর্যদা বুঝেনি, তার নিয়ামত তার

অজান্তেই ছিনিয়ে নেয়া হবে।

৯. দারিদ্র্যকে আল্লাহর নিকট সমর্পণ কর, তাহলে তাকে নিয়ে সকল কিছু থেকে তুমি অমুখাপেক্ষী হয়ে যাবে।

১০. পাঁচটি বস্তু সর্বোত্তম, এগুলো হল– ১. পাপের জন্য কাঁদা ২. স্বীয় দোষ-ত্রুটি সংশোধন করা ৩. আল্লাহর আনুগত্য করা ৪. অন্তরের মরিচা দূর করা ৫. প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ না করা।

১১. যৌবনকাল ইবাদতের জন্য উপযুক্ত সময়।

১২. হাশরের মাঠে উম্মতকে আহ্বান করা হবে নবী-রাসূলগণের পক্ষ থেকে আর আউলিয়ায়ে কিরামকে আহ্বান করা হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে।

১৩. আরিফ বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যার খাবার হবে অসুস্থ ব্যক্তির মত, যার ঘুম হবে বিষাক্ত সাপে কাঁটা ব্যক্তির মত এবং যার জীবন হবে পানিতে ডুবন্ত বা পড়া ব্যক্তির মত।

১৪. স্বীয় চাহিদার ওপর ইবাদতকে প্রাধান্য দেয়ার মাধ্যমে বান্দা কামালিয়াত অর্জন করতে পারে।

১৫. সাহসী নেতার পাঁচটি গুণ। এগুলো হল–১. ছলনা ব্যতীত শরিয়তের ওপর অটল থাকা, ২. ভুল-ভ্রান্তি ব্যতিত ইজতিহাদ ৩. অলসতা ছাড়া জেগে থাকা ৪. লৌকিকতা ছাড়া প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে আল্লাহর ধ্যানে মুরাকাবা করা ৫. মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা।

ওফাত শরীফ: ইমাম জুনাইদ বাগদাদী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, 'ইমাম সারি সাক্বাতি রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অসুস্থ অবস্থায় আমি তাঁর সেবা করতে গেলাম এবং তাঁকে পাখা দিয়ে বাতাস করা শুরু করলে তিনি আমাকে বলেন, জ্বলন্ত কয়লা বাতাসে আরো বেশি জ্বলে। কারণ আমার শরীরতো আল্লাহর প্রেমে জ্বলে কয়লা হয়ে গেছে। এরপর আমি বললাম আমাকে অসিয়ত করুন। তিনি আমাকে বললেন– 'মানুষের সংশ্রবের কারণে আল্লাহর সংশ্রব ত্যাগ করোনা।' অতঃপর তিনি ৩ রমজান মতান্তরে ৬ রমজান ২৫১ হিজরী মতান্তরে ২৫৩ বা ২৫৭ হিজরী শুক্রবার মতান্তরে মঙ্গলবার সকালে ৯৮ বছর বয়সে আল্লাহর সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে পরলোকে পাড়ি জমান। দজলা নদীর পশ্চিম পার্শ্বে বাগদাদ নগরীর শুনিবিয়্যা নামক কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তাঁর পাশে সমাহিত করা হয় তাঁর একনিষ্ঠ মুরীদ ও খলিফা ইমাম জুনাইদ বাগদাদী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে। এ ছাড়াও এ কবরস্থানে শুয়ে আছেন তাঁর পীর ইমাম মারুফ কারখী এবং হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত মুফাসসির এবং ফিকাহবিদ ইমাম আলুসী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা।

তথ্যসূত্র:

১. ইমাম যাহবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, মুয়াস্সাসাতুর রিসালা, বৈরুত, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হিজরী, ১২ খণ্ড, পৃ: ১৮৫-১৯১

২. ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, দারুল মাগরিব আল ইসলামী, ১ম সংস্করণ, ১০০৩ খৃ:, ৬ খণ্ড, পৃ: ৮৮

৩. ইমাম ইবনু খল্লিকান, ওয়াফিয়্যাতুল আইয়ান, দারু সাদির, বৈরুত, ১৯০০ইং, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৫৭

৪. ইমাম শারানী, আত্ তাবক্বাতুল কুবরা, মাকতাবাতু মুহাম্মদ আল মুলাইজী আল কুতুবী, মিশর, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৩

৫. আব্দুর রহমান সুলামী, তাবক্বাতুস্ সূফিয়া, দারু সাদির, বৈরুত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩১

৬. ইবনুল ইমাম, শাযরাতুজ জাহাব, দারু ইবনি কাসির, দামেস্ক, ১৪০৬ হিজরী, ২য় খণ্ড, পৃ: ১২৭

৭. আব্দুর রহমান চিশতী, মিরাতুল আসরার, মাকতাবাতু জামে নূর, দিল্লী, ১৪১৮ হিজরী, পৃ: ৩২১-৩২৪

৮. শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার, তাযকিরাতুল আউলিয়া, ইসলামী তাবলিগী মিশন, মাটিয়া মহল, দিল্লী, পৃ: ১৬১-১৬৪

৯. ইবনু যাওজী, সিফাতুস্ সাফওয়া, দারুল মারিফা, বৈরুত, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৯ হিজরী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৭১-৩৮৬

১০. আবু নয়ীম ইস্পাহানী, হিলইয়াতুল আউলিয়া, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪০৯ হিজরী, ১০ম খণ্ড, পৃ: ১১৬-১২৭।

১১. ইমাম নাবহানী, জামেউ কারামাতিল আউলিয়া, মারকাযে আহলে সুন্নাত বরকাতে রেযা, পুরবন্দ, গুজরাট, ভারত, ২য় খণ্ড পৃ: ৮৮-৯০

১২. ইমাম কুশাইরী, আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ, দারুল মায়ারিফ, কায়রো, মিশর, পৃ: ৪৫-৮৭

১৩. ইমাম গাজ্জালী, ইহইয়াউ উলূমিদ্দিন, দারুল মারিফাহ, বৈরুত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৮০

১৪. আবু তালিব মক্কী, কূতুল কুলূব, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ৩য় সংস্করণ, ১৪২৬ হিজরী, ২য় খণ্ড, ৪৩৮

সিয়াম বা রোজার হাকিকত

● শেখ আবুল বাসার ●

মহান আল্লাহ তা'আলা কালামে পাকে বলেন, 'ইয়া আইয়্যুহাল লাযীনা আমানু কুতিবা আলাইকুমুচ্ছিয়ামু কামা কুতিবা আলাল্লাজীনা মিন কাবলিকুম লাআল্লাকুম তাত্তাকুন।' 'হে আমানুগন তোমাদের উপর সিয়ামকে বিধান রূপে (ফরজ) দেয়া হল, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর বিধান রূপে (ফরজ) দেয়া হয়েছিল। সম্ভবতঃ তোমরা মুত্তাকী হতে পারবে।' বাকারা ২ঃ১৮৩। এ আয়াতে কারিমায় 'মিন কাবলিকুম' বাক্যটিতে পূর্বজাতিদের মধ্যেও তাদের শরীয়ত মোতাবেক রোজার বিধান ছিল। আল্লামা কাছীর তাঁর তফসীর গ্রন্থে বলেন, 'হযরত জেহাক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হযরত নুহ আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে প্রত্যেক মাসে তিনটি রোজা প্রচলিত ছিল। রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত ইবনে আমরকে বলেন, 'আল্লাহ তা'আলার নিকট যে রোজা উত্তম সে রোজা রাখ, আর তা হল হযরত দাউদ আলাইহে ওয়াসাল্লামের রোজা। তিনি একদিন রোজা রাখতেন আর একদিন ইফতার করতেন বা একদিন পর একদিন রোজা রাখতেন।'

প্রত্যেক ধর্মেই উপবাসের বিধান আছে, কেননা তা পাশবিক প্রবৃত্তি দমনের প্রধান উপায়। রোমান জাতি, বেবিলিয়ন জাতি, এসিরিয়ন জাতি, হিন্দু জাতি, চিনা জাতি, ইয়াহুদি জাতি সকলের জন্যই উপবাসের বিধান জারি ছিল। বিশেষভাবে হিন্দু জাতিয় ধর্মে জন্মাষ্টমী, শিবরাত্রি, অমাবশ্যা ও পূর্ণিমা, দুই একাদশী ইত্যাদি ক্ষেত্রে উপবাস ব্রত পালন করতে হয়। ইয়াহুদী জাতি তাদের ধর্ম প্রবর্তক হযরত মুসা আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর সিনাই পর্বত হতে তাওরাত কিতাব প্রাপ্তির স্মৃতি রক্ষার্থে বছরে চল্লিশ দিন উপবাস ব্রত পালন করে। কেননা হযরত মুসা আলাইহে ওয়াসাল্লাম একাদিক্রমে চল্লিশ দিন উপবাসের পর তওরাত কেতাব প্রাপ্তির সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। উপবাস পদ্ধতি বহু প্রাচীন কাল হতেই প্রচলিত আছে। তবে দুঃখের বিষয় তাদের উপবাসের ধারা, রীতি নীতি প্রায়ই বিকৃত হয়ে পড়েছে। হয়ত এ কার্যবিকৃতির কারণ উপবাসের সময়, নিয়মানুবর্তীতা ও কার্যপ্রণালীর বিস্তারিত বর্ণনার অভাব। পক্ষান্তরে ইসলাম ধর্ম উপবাসকে পূর্ণ করেছে 'সিয়াম' বিধানকে বিস্তারিত বর্ণনার মাধ্যমে।

দ্বিতীয় হিযরীতে রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর উপর রোজার নির্দেশবাণী মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে। প্রথমেই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রোজা বা উপবাসের নিয়ম ধারা ও উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করে ইবাদত পদ্ধতিকে পূর্ণতা দান করেন। পূর্বকালে শোক ও দুঃখের স্মৃতি রক্ষার্থে উপবাস ব্রত পালনের প্রথা প্রচলিত ছিল। কখনও বিশেষ কোন ঘটনার স্মরণার্থেও উপবাস পালনের প্রথা প্রচলিত ছিল। তখন উপবাসকারীদের অনেকেরই উদ্দেশ্য থাকত বিভিন্ন দেবতাদের ক্রোধ ভঞ্জন বা প্রসন্নতা লাভ করা। উপবাসের এরূপ পৌত্তলিক পরিকল্পনা দূর পূর্বক ইসলাম তৎপরিবর্তে মহৎ উদ্দেশ্য প্রবর্তন করেছে।

দেখা যায় কোন বন্য হিংস্র পশুকে বশে আনতে হলে কয়েকদিন খাদ্য না দিয়ে বা অল্প খাদ্য দিয়ে তার শক্তি ও ক্রোধকে দমন করা হয়। অতঃপর উক্ত হিংস্র পশু বশে বা মানুষের নিয়ন্ত্রণে থাকে। অতঃপর তাদের মাধ্যমে মানুষের অনেক উপকার লাভ হয়। এভাবে দেখা যায় উপবাসের মাধ্যমে পশুর প্রধান প্রধান অঙ্গগুলি দুর্বল হয় এবং তাতে পাশবিক প্রবৃত্তিও শক্তিহীন হয়।

রোজা বা উপবাসের ফলে কুপ্রবৃত্তি বশে থাকে। অধিক খাদ্য দেহে যৌন প্রবৃত্তির মস্তক উত্তোলন করে এবং আধ্যাত্মিক জগতে বিভৎস হট্টগোল সৃষ্টি করে। শরীর যতই দুর্বল হবে ততই যৌন ও কুপ্রবৃত্তি দুর্বল হবে। সুতরাং যার যৌন প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল তার জন্য উপবাসের বিধান দেয়া হয়। এইরূপ দৈনন্দিন উপবাস এবং স্বল্প পরিমাণ খাদ্য যৌন প্রবৃত্তিকে বশে আনে। মহান আল্লাহ তা'আলা যখন বছরে বার মাসের মধ্যে এক মাস ইন্দ্রিয় সংযমের জন্য রোজা ব্রত পালনের ব্যবস্থা করেছেন, তিনি নিশ্চয়ই তা মানুষের মঙ্গলের জন্যই করেছেন।

রোজা আত্মাকে উজ্জ্বল করে, রোজায় যখন পাশবিক প্রবৃত্তি দমিত হয় তখন আত্মার তেজ ও শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। অতিমাত্রায় ভোজন ও পানে আত্মা নিস্তেজ হয়ে পড়ে, মানবের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি লোপ পায়। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বলেন, ক্ষুধার্ত উদর জ্ঞানের উৎস। সুতরাং রোজা রেখে জ্ঞান বৃদ্ধি করা উচিত। সূত্রঃ 'মানব ধর্ম' ৩১১-১৩ পৃঃ মাওঃ ফজলুল করিম, ৪র্থ মুদ্রণ ১৯৬২ইং।

অন্য জাতি বা ধর্মের উপবাস সমুহের দিন নির্ধারণ হয় সাধারণতঃ ইংরেজী মাসের হিসাবে। যা সর্বদাই বছরের একই সময়ে আরম্ভ হয়। পক্ষান্তরে ইসলাম ধর্মে রোজা হিজরী বা চান্দ্র মাসের হিসাব অনুযায়ী করা হয়। যার ফলে একজন রোজাদার সারা বছরের বিভিন্ন সময়ে রোজা পালন

করতে পারে। কারণ চান্দ্রমাস প্রতি ছত্রিশ বছর পরপর আবার পূর্বতন সময়ে বা ইংরেজী মাসে ফিরে আসে। এভাবে চক্রাকারে ক্রমান্বয়ে আবর্তিত হতে থাকে। তাই বছরের শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সবসময়ই প্রকারান্তরে রোজা রাখা হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি একাধারে ছত্রিশ বছর রোজা রাখতে পারে তার হিসাবে দেখা যায় সে ব্যক্তি সমগ্র বছর ব্যাপি রোজা পালন করবার প্রশিক্ষণ পেয়েছে।

ইসলাম ধর্মে রোজার বিধান জারী করা হয় হিজরী দ্বিতীয় বৎসরে। তাই ইসলামের প্রাথমিক জীবনে বা মক্কার জীবনে রোজার প্রচলন ছিল না। মানুষ যখন ইসলামের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল হয়ে ইসলাম শিশু থেকে কৈশোরে পদার্পন করেছিল তখনই রোজার মত কঠিন ইবাদতের বিধান দেয়া হয়। যেহেতু মহান আল্লাহ তা'আলার প্রথম বাণী রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট প্রথম অবতীর্ণ হয় মক্কার হেরা গুহাভ্যন্তরে, সে দিনটি রমজান মাসের সতের তারিখ বলে হাদীসে উল্লেখ আছে। অতঃপর মহান আল্লাহ তা'আলা এ প্রথম কুরআন নাজিলের মাসটিকেই পবিত্র রাখার জন্য রমজান মাসেই রোজা রাখার আদেশ দিয়েছেন প্রিয় মাহবুবকে। যার মাধ্যমে মাহবুবের সে স্মরণীয় দিনটিকে পৃথিবীর সমগ্র মানব বিশেষ করে মুসলমানগণ সুদূর কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত এই মাস স্মরণের জন্য রোজা রমজান মাসে চালু থাকবে।

রোজা আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমানকে সজীব রাখে। রোজা একটি বিশিষ্ট ইবাদত। কেননা উপবাসী ব্যক্তিগণ আল্লাহ তা'আলার ভয়ে দিবাভাগে কণামাত্র খাদ্যাদি গ্রহণ করে না। কেননা উপবাসী ব্যক্তিরা আল্লাহ তা'আলার ভয়ে গৃহাভ্যন্তরে নিভৃত কোণে লোকজনের অসাক্ষাতেও খাদ্য দ্বারা উদর পূর্ণ করতে পারে। বিশেষ কেউ তাকে সেখানে দেখার নেই। গ্রীষ্মকালের প্রখর রৌদ্রের তাপে যখন কণ্ঠনালী নিরস শুষ্ক হয়ে যায় এবং এক ফোটা পানি পান করলেও তাতে শান্তি লাভ হয় অথবা নদী পুকুরের পানিতে গোসল করার সময় ডুব দিয়ে পেট পুরে পানি খেলেও কেউ দেখবে না। বরং দেহ মনের ক্লান্তি দূর হবে। কিন্তু রোজাধারী ব্যক্তি মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার ভয়ে এমন অনুকূল অবস্থায়ও পানাহার হতে বিরত থাকে। এটা যদি বিশিষ্ট খাঁটি ইবাদত না হয়ে থাকে তবে আর কোন ইবাদত খাঁটি হবে? এ ইবাদতে রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা নেই। অন্য সকল ইবাদতের মধ্যে রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা আছে। এ ইবাদতে আত্মসংযম শিক্ষা দেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলার ভয়ে আল্লাহকে খুব নিকটে মনে হয়। এভাবে একদিন নয়, দু' দিন নয়, দীর্ঘ এক মাস পর্যন্ত আল্লাহর বিশ্বাসে এই রোজা চলতে থাকে এবং তাতে অপেক্ষাকৃত এক উচ্চ সংযমী জীবনের আভাষ পাওয়া যায় এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান গভীর হতে আরও গভীরতর হতে থাকে।

রোজার প্রাণ ঃ শরীর ও মনের যখন পরস্পর নিগুঢ় সম্পর্ক তখন শরীর খাদ্য ও পানি গ্রহণ হতে বঞ্চিত থাকলেই কুপ্রবৃত্তি দমন হয়। এ দু' উদ্দেশ্য ভঙ্গ হলেই রোজা ভঙ্গ হয়ে যায়, অর্থাৎ দিবাভাগে খাদ্য ও পানি গ্রহণ করলে। ব্যভিচার বা স্ত্রী সংসর্গ করলে রোজা ভঙ্গ হয়। শরীয়ত বিশেষজ্ঞগণ রোজার দৈহিক অংশের দিকেই বেশী দৃষ্টি দিয়েছেন, পক্ষান্তরে তরীকত পন্থিগণ রোজার মূল বা প্রাণের দিকেই বিশেষ তাকিদ দিয়েছেন। কিন্তু রোজার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উভয়ই প্রয়োজনীয়। ফকীহগণ রোজার প্রাণ ভঙ্গ হলে রোজা ভঙ্গের নির্দেশ প্রদান করেন নি। কেননা মনের বিচার মানবের সাধ্যাতীত। তাই রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'বহু সংখ্যক রোজাদারী আছে তাদের তৃষ্ণা ও ক্ষুধায় কষ্ট পাওয়া ব্যতীত কোন লাভ হয় না। এবং বহু সংখ্যক সালাতী আছে উঠা বসা এবং নৈশ যাপন ব্যতীত আর কোন লাভ হয় না।'

"নফসের কামনাকে সংযত ও নিয়ন্ত্রণে রাখাই হল রোজার হাকীকত। সমস্ত মূল মগজের মধ্যে লুক্কায়িত। তাই হযরত জুনায়েদ বোগদাদী রহমতুল্লাহে আলাইহে বলেন, 'রোজা তরিকতের অর্ধাংশ।' হযরত আলী হাজরিরী রহমতুল্লাহে আলাইহে বলেন, 'আমি একবার রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখে আরজ করলাম, হে আল্লাহ'র রাসূল, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, 'তোমার পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণে রাখ'। কেননা মানুষ তার এ ইন্দ্রিয় যথা- চোখ, কান, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক দ্বারা নেক ও পাপ কাজ করতে পারে। এ পঞ্চ ইন্দ্রিয় মহান আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও নাফরমানীর জন্য সমান উপযোগী। একদিকে ইলম, আকল ও রূহ এবং অন্যদিকে নফস ও কামনাকে এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় ব্যবহারের জন্য সমান সুযোগ দেয়া হয়েছে। এ কাজ মানুষের ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে যে, সে এ পঞ্চ ইন্দ্রিয় স্বীয় নিয়ন্ত্রণে রেখে তা ইলম, আকল ও রূহের মাধ্যমে ব্যবহারের চেষ্টা করবে কিংবা নফসের কামনা বাসনার উপর ছেড়ে দেবে। সুতরাং এগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য রোজা রাখা অপেক্ষা অন্য কোন উপায় নেই। হযরত সহল ইবনে আবদুল্লাহ তশতরী রহমতুল্লাহে আলাইহে সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি প্রতি মাসের পনের তারিখে একবার আহার করতেন। আবার রমজান মাসের

শুরু থেকে ঈদ পর্যন্ত কোন পানাহার করতেন না। এতদসত্ত্বেও তিনি প্রতি রাত্রে চারশত রাকায়াত নফল সালাত আদায় করতেন। মহান আল্লাহ তা'আলার বিশেষ মেহেরবানী ছাড়া কারও পক্ষে এরূপ করা কখনও সম্ভব নয়।

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম রহমতুল্লাহে আলাইহে সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি রমজান মাসে কোনকিছু পানাহার করতেন না। এক রমজান ছিল গরমের মাস। তিনি সারাদিন গম কেটে যা পারিশ্রমিক পেতেন তা দরিদ্রদেরকে দান করে দিতেন। তিনি কিছু পানাহার করেন কিনা তা দেখার জন্য গোপনে লোকজন তার পিছে লেগে থাকল। কিন্তু কেউ তাঁকে পানাহার করতে দেখেনি এবং কেউ তাঁকে ঘুমাতেও দেখেনি। হযরত শায়খ আবু নসর তাউসুল ফোকারা একবার রমজান মাসে বাগদাদ উপস্থিত হন। তাঁকে শোনেমিয়া মসজিদের একটি কামরায় থাকতে দেয়া হয়। সেখানে মসজিদে তাঁকে তারাবীহর সালাতে ইমামতীর দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি তারাবীর সালাতে পাঁচবার কুরআন খতম করিতেন। প্রতি রাত্রে তাঁর খাওয়ার জন্য একটি করে রুটি দেয়া হত। অতপর ঈদের দিন তিনি সালাতে ইমামতী করাতে গেলে মসজিদের খাদেম তাঁর কক্ষে প্রবেশ করে দেখেন ত্রিশ দিনের বরাদ্দ ত্রিশটি রুটিই মেঝেতে পড়ে আছে। একখানা রুটিও তিনি খাদ্য হিসেবে কবুল করেন নি। মহান আল্লাহ তা'আলার বিশেষ মেহেরবানী ব্যতীত কখনও এমন পানাহার সম্ভব নয়।" - সূত্রঃ কাশফুল মাহজুব, ১৭৭-৭৯ পৃঃ, হযরত দাতা গঞ্জে বখশ (মুদ্রণ-১৯৯৯ইং)

রোজা পালন করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো রোজার জন্য সম্মান প্রদর্শন করতে পারে। অর্থাৎ সেগুলো ব্যবহারে সংযমী কিংবা বিরত থাকতে হবে। সে অঙ্গগুলো হল চোখ, কান, হাত পা ও মুখ। এ পাঁচটি অঙ্গকেই রোজা রাখার জন্য শিক্ষা দিতে হবে।

চোখের রোজা ঃ রোজাদারকে অবশ্যই অবৈধ দৃষ্টিকটু বস্তু দেখা থেকে বিরত থাকতে হবে। মনে কামভাব নিয়ে কোন বেগানা নারীর দিকে তাকানো যাবে না। রোজাদারের জন্য অনৈসলামিক অশ্লীল কুৎসিত চলচ্চিত্র এবং বিভিন্ন মূর্তি দেখা উচিত নয়। তবেই চোখের রোজা হবে।

কানের রোজা ঃ রোজাদারকে অবশ্যই নিষিদ্ধ এবং কুরুচিপূর্ণ কথা শোনা থেকে বিরত থাকতে হবে। বিভিন্ন গান বাজনা বিশেষ করে কুরুচিপূর্ণ নাচগান শোনা থেকে বিরত থাকতে হবে। কান সমূহকে এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারলে কানের রোজা পূর্ণ হবে।

পায়ের রোজা ঃ খারাপ কাজ করার নিয়তে কোথাও যাওয়া বা কোন বেগানা মহিলার বাড়ীতে অসৎ উদ্দেশ্যে হেঁটে যাওয়া থেকে বিরত থাকাই পায়ের রোজা।

হাতের রোজা ঃ হাত দ্বারা পরের দ্রব্য অপহরণ করা, কাকেও বিনা কারণে আঘাত করা, অবৈধ সুদ-ঘুষ লেনদেন করা ইত্যাদি কাজ হতে বিরত থাকা হাতের রোজা।

মুখের রোজা ঃ কারোও গীবত করা, মুখে অশ্লীল কথাবার্তা বলা, চোগলখুরী করা, মিথ্যা কথা বলা, শ্রুতিকটু শব্দ ব্যবহার করা, বাজে গল্প গুজব করা, কাউকে গালমন্দ করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকাই মুখের রোজা।

"রোজার মাধ্যমে অন্তর এমন পবিত্রতা অর্জন করে যে, চতুষ্পদ জন্তু, হিংস্র প্রাণীর চরিত্র ও নাপাকী দূর হয়ে যায় এবং লতিফায়ে সীর হতে অন্ধকার বের হয়ে যায়। এ অবস্থায় রোজাকে কোন সাধারণ বিষয় বললে চলবে না, রোজা এবং তৃষ্ণার মধ্যে বিস্ময়কর কামালত রয়েছে। "জজবাত" সূফি সম্প্রদায়ের নিকট একটি প্রসিদ্ধ বিষয়। তাঁরা যখন অন্তর দিয়ে আল্লাহ তা'আলার বাণী শ্রবণ করার আশা করেন, তখন তাঁরা চল্লিশ দিন অনাহারে কাটান। ত্রিশ দিন পর ইফতারের উদ্দেশ্যে মিসওয়াক করেন এরপর আরও দশদিন দানা পানি ছাড়া থাকেন। ফল স্বরূপ মহান আল্লাহ তা'আলা তাদের গোপন অন্তরের সাথে কথা বলেন। কিন্তু এর কারণও রয়েছে তা হল, নবীদের জন্য যা প্রকাশ্যে জায়েজ অলী আউলিয়াদের জন্য তা গোপনে জায়েজ। জনৈক বুজুর্গ বলেন, মুরিদের মধ্যে তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক, ১. নিদ্রা না আসলে নিদ্রা যাবে না। ২. বিনা প্রয়োজনে কথা বলবে না। ৩. ক্ষুধা না পেলে আহার করবে না।

এখন তবে প্রশ্ন থাকে, রোজা কাকে বলে? কেউ বলেন, তা দু' রাত দু' দিন, কেউ বলেন তিন রাত তিন দিন আবার কারো মতে এক সপ্তাহ, অনেকের মতে চল্লিশ দিন।

হযরত জুন্নুন মিসরী রহমতুল্লাহে আলাইহে বলতেন, 'পার্থিব জীবন তো মাত্র এক দিনের সমান, তাই একদিন রোজা রাখা আর তেমন কষ্টের কী?' অন্য এক বুজুর্গ বলতেন, 'দুনিয়া হতে রোজা রাখ আর মৃত্যু দ্বারা ইফতার কর।' মানুষ হল সকল সৃষ্টির সার সংক্ষেপ অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষই রহস্যের আধার ও করণাধারা। তার কাজ কারবার কোন সাধারণ বিষয় নয়। আসমান, জমীন, আরশ, কুরসী, জান্নাত, জাহান্নাম সকল কিছুই মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষের সৃষ্টি ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য নতুবা কিছুই

সৃষ্টি হত না। তবুও মানুষের সাথে এ ধরনের ঘটনা ঘটে কেন ? কারণ, হাকিমের কাজ কোন হেকমত বিহীন হয় না। আজল হতে এই নির্দেশ জারী করা হয়েছে যে, এ রাস্তা অতিক্রম করতে হবে। সূত্রঃ মাকতুবাতে সাদী, ১৭২পৃ, ২০০৭ মুদ্রণ, তাজ কোং।

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, 'যে ব্যক্তি প্রতি সপ্তাহে সোমবার এবং বৃহস্পতিবার দিন রোজা রাখে তার গুরুত্ব কী?' প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'প্রতি বৃহস্পতিবার মানুষের আমলনামা আসমানে উপস্থিত করা হয়, আর সোমবার সপ্তাহের এমন গুরুত্বপূর্ণ দিন যে, ঐ দিন মহান আল্লাহ তা'আলা আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমার কাছে প্রথম ওহীও নাজিল হয়েছে সোমবার দিন সতেরই রমজান। কাজেই এ দু' দিন রোজা রাখার গুরুত্ব অপরীসীম। আমি নিজেও প্রতি সোমবার দিন রোজ রাখি।' সূত্রঃ গুণিয়াতুত তালেবীন, ২৪০ পৃ, দ্বিতীয় খন্ড, ১৯৭৫ মুদ্রণ, ইসলামীয়া লাইব্রেরি, চট্টগ্রাম।

রোজা মহান আল্লাহ তা'আলার প্রতিপক্ষের উপর ভীষণ চাপ সৃষ্টি করে। কেননা, কামনা - বাসনা ও কুস্বভাব হল আল্লাহর প্রতিপক্ষ ও শয়তানের হাতিয়ার সদৃশ, যেগুলো পানাহার দ্বারা পুষ্ট ও শক্ত সবল হয়। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'শয়তান মানুষের ধমনিতে চলাচল করে। তোমরা ক্ষুধা তৃষ্ণার মাধ্যমে সে ধমনিকে সংকীর্ণ করে দাও। তোমরা সর্বদা বেহেশতের দরজায় কড়া নাড়তে থাক।' তাঁকে জিজ্ঞেসা করা হল, 'তা কিভাবে সম্ভব ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম?' তিনি বললেন, 'ক্ষুধার দ্বারা, যেহেতু রোজা বিশেষ ভাবে শয়তানকে বন্দি করে। তার চলার পথকে বন্ধ ও সংকীর্ণ করে, একারণে রোজা আল্লাহর সাথে বিশেষ ভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার গৌরব লাভ করেছে।' শয়তানকে জব্দ করার ব্যাপারে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা রোজাদারকে সাহায্য করেন। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'ওয়াল্লাজিনা জাহাদু ফি-না লা-নাহদিয়ান্নাহু সুবুলানা' 'এবং যারা আমার কাছে যাওয়ার জন্য কঠোর চেষ্টা সাধনা (জিহাদ) করে, আমি তাদের অবশ্যই পথের সন্ধান দিয়ে থাকি।' আনকাবুত ২৯:৬৯। মহান আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, ' ইন্নাল্লাহা-লাইউ গাইয়্যিরু মাবি ক্বাওমিন হাত্তা ইউ গাইয়্যিরু মাবি আনফুসিহিম' । 'আল্লাহ কোন কওমের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।' রা'আদ ১৩:১১। এ পরিবর্তনের জন্য নিজের ইচ্ছায় সর্বপ্রথম মনকে আল্লাহ তা'আলার পথে ধাবিত করতে হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার মেহেরবাণী পাওয়া যাবে। এ কথার সমর্থন মহান আল্লাহ তা'আলার হাদীসে কুদসীতে পাওয়া যায়। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছায় আমার দিকে এক কদম অগ্রসর হয় আমি তার দিকে দৌড়ে যাই'। অতএব এ পরিবর্তনের জন্য কামনা বাসনাকে পর্যুদস্ত ও নিষ্পেষিত করতে মানবকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেননা এগুলো শয়তানের আনাগোনার কেন্দ্র। যে পর্যন্ত এ কেন্দ্র আবাদ থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত শয়তানের আনাগোনা বন্ধ হবে না। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, 'মানুষের অন্তরে (কলবে) যদি শয়তানের আনাগোনা না থাকত তা হলে মানুষ উর্ধ্ব জগত দেখার দৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে যেতো।' অতএব, যেকোন ইবাদত বন্দেগী করার পূর্বে অবশ্যই শয়তানের আনাগোনার রাস্তা বন্ধ করে কলবকে শয়তান মুক্ত করতে হবে। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'রোজা ঢাল স্বরূপ। তোমরা রোজা রাখলে কেউ যেন অনর্থক এবং অশ্লীল কথা না বল। কেউ তোমাদের সাথে ঝগড়া করতে এলে বা তোমাদের গালি দিলে বলবে, আমি রোজা রেখেছি।'

একদা হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কাছে রোজা অবস্থায় দু'জন মহিলা এসে বলেন, 'হুজুর আমরা পিপাসা ও ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়েছি। বেলাও শেষ প্রায়, কণ্ঠতালু শুকিয়ে যাচ্ছে। আর রোজা রাখতে পারছিনা। আমাদের দু'জনকে রোজা ত্যাগ করার অনুমতি দিন।' হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের হাতে দু'খানা পেয়ালা দিয়ে বললেন, 'এ পাত্রে তোমরা যা খেয়ে রোজা রেখেছিলে তা বমি করে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।' অতঃপর একজন মহিলা আড়ালে গিয়ে তাজা গোশত এবং টাটকা রক্ত বমি করল। অন্য পেয়ালায় অন্য মহিলাও একই বস্তু বমি করল। পেয়ালা দুটি রক্ত এবং গোশতে পূর্ণ হয়ে গেল। উপস্থিত সাহাবাগণ তা দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেল। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উক্ত পেয়ালা দেখে বললেন, 'এরা দুজনেই হালাল দ্রব্য খেয়ে রোজা রেখেছিল। কিন্তু হারামকৃত বিষয় দ্বারা রোজা নষ্ট করেছে। এ দু' মহিলা এক জায়গায় বসে পরনিন্দা চর্চা ও পরস্পর গীবত করেছে। এদের সেই পরনিন্দা চর্চার কারণেই তাদের পেটের খাদ্য এ অবস্থায় টাটকা গোশত এবং রক্তের রূপ ধারন করেছে।' সূত্রঃ এহইয়াউ উলুমুদ্দিন, প্রথম খন্ড, ২১৭-২০পৃ, ২০০৬ই মুদ্রণ। (চলবে)

কবিয়াল রমেশ শীল

●মোঃ গোলাম রসুল●

আমি প্রথম মাইজভাণ্ডার শরীফ যাই ১৯৮৬ সালে। জনাব আলী নবী চৌধুরী, নির্বাহী প্রকৌশলী/চবক আমাকে নিয়ে যান এবং তাঁর মাধ্যমেই বাবাজন শাহানশাহ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর সংগে আমার সাক্ষাত হয়। আমি সেমার গান শুনে অনেকটা অভিভূত হয়ে যাই। আলী নবী চৌধুরী আমাকে বলেন যে, কবিয়াল রমেশ শীল অনেক ভক্তিমূলক গান গেয়েছেন, যার কোন তুলনা হয় না। তখন থেকেই রমেশ শীলের বাড়ীতে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমার মাঝে জেগে উঠে। আমি কেবল সুযোগ খুঁজতে থাকি। তারপর অনেক বছর গড়িয়ে যায়।

যাহোক, ২০১২ সালের ২৩ মার্চ ঐ সুযোগ এসে যায়। আমার এক সহকর্মী খোকা রঞ্জন শীলের ছোট মেয়ের বিয়ের দিন ধার্য হয় এবং কবিয়াল রমেশ শীলের বাড়ীতেই বিয়ের অনুষ্ঠান হবে জেনে আমি মনে মনে খুশী হই। যথারীতি বিয়ের নিমন্ত্রণ আমি পাই এবং অন্যান্য অতিথিদের সংগে ঐ তারিখে (শুক্রবারে) আমি কবিয়াল রমেশ শীলের বাড়ীতে চলে যাই। কবিয়াল রমেশ শীল ১৮৭৭ ইং (বাংলা ১২৮৪) সালের ২৬ বৈশাখ চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী থানার গোমদণ্ডী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম চণ্ডীচরন শীল এবং মাতার নাম শ্রীমতি রাজকুমারী শীল। মাত্র ১১ বছর বয়সে ১৮৮৮ সালে তিনি তাঁর পিতাকে হারান এবং ছয় সদস্যের পরিবারের ভরণ-পোষণের দয়িত্ব গ্রহণ করেন। তখন তিনি তৃতীয় শ্রেণীতে পড়তেন, পিতার মৃত্যুর পর পড়াশুনার পরিসমাপ্তি ঘটে। তারপর জীবিকার প্রয়োজনে তিনি ক্ষৌরকর্ম ও স্বর্ণ শিল্পির কাজ, চালের দোকানে চাকুরি প্রভৃতি কাজ করেন। পরবর্তীতে কবিরাজি, কবিগান ও গণসংস্কৃতি চর্চায় ব্রত হন। ১৮৮৮ সালে তিনি বার্মা চলে যান, কিন্তু আপনজনের টানে আবার ১৮৯৫ সালে স্বদেশে চলে আসেন এবং কবিরাজি পেশায় আত্মনিয়োগ করেন। পাশাপাশি তিনি লোক সংস্কৃতির সংগে জড়িয়ে পড়েন। পাজীর গীত, জারীগান, সারিগান, ঢপকীর্তন, পাল্টা কীর্তন, কবিগান, যাত্রাগান, যাত্রাভিনয়, পালাগান, পল্লীগীতি প্রভৃতিতে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন।

কবিয়াল মোহন বাঁশী ও কবিয়াল চিন্তাহরণের কবিগান অনুষ্ঠানে হঠাৎ করে চিন্তাহরণ অসুস্থ হলে উপস্থিত সবার অনুরোধে ২১ বছরের রমেশ শীল কবিয়াল মোহন বাঁশীর বিপরীতে অবতীর্ণ হন। ১৮ ঘন্টা ব্যাপী প্রতিযোগিতায় তিনি মোহন বাঁশীকে বিপর্যস্ত করে তোলেন। এরফলে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

১৮৯৯ সালে প্রবীণ কবিয়াল নবীন ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন্ তারপর গুরু-শিষ্য মিলে কবিগান উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন। অনেক সময় গুরু শিষ্যের কাছে হেরে গেলেও গৌরব বোধ করতেন। তাঁর গুরু নবীন ঠাকুর এর কাছে তিনি কবিগানের মাধ্যমে বিশ্বমানবতার চর্চা, সকল ধর্মের সমন্বয়বাদী দর্শন ও অশ্লীলতা দূরীকরণের দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাছাড়া কবিয়াল দীনবন্ধু শীলের প্রভাবও তাঁর উপর পড়ে।

১৯০২ সালে তিনি অপূর্ববালাকে বিয়ে করেন। পরপর তাঁদের চার সন্তান মৃত্যুবরণ করার পর তাঁর স্ত্রী মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন। তাঁর দিদিমা কৈশল্যাবালার অনুরোধে তিনি অবলাবালাকে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসাবে বিয়ে করেন। তখন তাঁর জীবনের দুই শক্তিধারা প্রবাহিত হলো। ১৯২৩ সালে তিনি সর্বপ্রথম মাইজভাণ্ডার শরীফ গমন করেন। বাবাভাণ্ডারী হযরত গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী (রাঃ) এর নজরে করম লাভ করেন। তখন রমেশ শীল সেমার গানে মনোনিবেশ করেন এবং গেয়ে উঠেন:

১. দয়ার অবতার করুনা আধার এসেছ পাতকি ত্বরাতে
মহিমা মহান, হয়ে কৃপাবান সত্যের সন্ধান জানাতে
হাতাশা-নিরাশা, পাতকি দলে, অবগাহি তব পূণ্য সলিলে
ধোয়ায়ে নিবে পাপ পঙ্কিলে তোমার করুণা ধারাতে।
সাম্য মৈত্রী দয়া পেয়ে তব দান,
ভূলোকে দ্যুলকে নাচে সবার প্রাণ,
স্রষ্টা সৃজন বিধাতা বিধান, সকলি সম্ভবে তোমাতে।
প্রকটে আনিয়া পদ দুইখানি
পদস্পর্শে আজ পবিত্রা ধরনী,
আকাশে বাতাসে তোমার জয় ধ্বনী গাইছে বিশ্ব জগতে।
ভাঙ্গা টুটা দেহ স্বল্পায়ু মানবে,
তোমার অর্চনা কী দিয়ে সম্ভবে,
লও ভক্তি উপহার কিছু নাই আর ও রাঙাচরণ পুজিতে

২. শুন শুন ঐ বাজিছে ঐ মওলার বাঁশী আজব শানে
বাঁশীর সুরে আকুল করে বিরহী প্রাণ ধরে টানে
গাউসিয়তের সুরে বাঁশী, বাজিতেছে দিবা-নিশি,

কি মধুর মাওলার বাঁশী না জানি কি টোনা জানে।
যখন বাঁশীর শব্দ ছোটে, মনকের কানে কাঁটা ফুটে,
আশেকি সেমা লুটে যার যেমন কান তেমনি শুনে।
বাঁশী বাজে লাহুতে, মাওলার খাস গদিতে
জব্রুত মলকুত নাছুতে, ঘুমন্ত জাগায়ে আনে।
কুতুব আবদাল গুলিগণে, জজবা করে বাঁশী তানে,
মাওলার বাঁশী কি গুণ জানে, যমুনা জল উজান টানে।
দয়াল বাবা মাইজভাণ্ডারী, রমেশেরে দয়া করি,
প্রাণ মন্দিরের কপাট খুলি বাঁশী বাজাও নিশি-দিনে।

৩. মুরশিদও নিদানের বন্ধু এইদাসে কবুল করলামি
তোমার কৃপা পাবার আশে ঘুরি দিন যামিনী।
তুমি আমার খোদা রাসুল দিল ঈমানে জানি
অদেখা রাসুলের আশেক ছিল ওয়াছ করনি।
আমি দেখে আশেক হতে নারি,
বিনে তোমার মেহেরবাণী।
(মুরশিদও) সারা দুনিয়ায় তোমার নামের ডঙ্কা শুনি।
পাক কালামে হুয়াল জাহের তুমি বলে জানি।
খোদার আশেক নবী তুমি নবীর আশেক জানি।
তোমার আশেক করলে মোরে কি কর্মে কও শুনি।
(মুরশিদও) রমেশ জাঙ্গারী লোহা, তুমি পরশ মনি
কদমে পরশ কর, নয় কর কোর্বানী।

৪. ভাব অবোধ মন হরদমে ভাণ্ডারী চরণ।
ঐ চরণে স্মরণ নিলে বিপদ হয়না কদাচন।
মাইজভাণ্ডারীর জোড় কদমে বিফল আছে জান না,
পাপীর ভাগ্যে দেখা দিল ভাণ্ডারেতে মাওলানা,
ঐ কদম বরকতে পাবি কাবা কাশি বৃন্দাবন।
মাওলার প্রতি ভক্তি রাখ মুখে ডাক ভাণ্ডারী
মাওলা বিনে আর কেহ নাই, নিতে জীবে পার করি।
শয়নে স্বপনে ধ্যানে দিবে হঠাৎ দরশন।
নামের গুণে কলব খোলে, নামের গুণ কি চমৎকার,
দিলের পর্দা কেটে যাবে, ঘুচে যাবে অন্ধকার
মিলিবে আনন্দের বাজার হবে প্রেম উদ্দিপন।
রমেশ বলে ভাণ্ডারী নাম নিতে আমার ভাগ্যে নাই,
ভবে এসে মায়া বশে, রিপু বশে দিন কাটাই।
কতদিনে এ অধীনে দয়া করে মাওলা ধন।

এই ধরণের অসংখ্য ভাণ্ডারী গান রমেশ শীল গেয়েছেন সারা জীবন। নানারকম বাদ্যগানের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল। তাঁর মধ্যে 'বৃহৎ তরজার লাড়াই' রমেশ শীলের মনে বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি করে। তাঁর যুগে তরজার প্রধান বিষয় ছিল পীর-মুরশীদ বা গুরু-শিষ্যের মধ্যে ধর্মতত্ত্ব, আধ্যাত্মিকতা, মানবজীবন প্রভৃতি সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর, সুর ও ছন্দ ছিল এ বিতর্কের অপরিহার্য অংগ। রমেশ শীল কয়েকজন সমবয়সীকে সংগে নিয়ে বাড়ীর দেউড়িতে তরজা গানের চর্চা করতেন। রমেশ শীলের রচনাবলী বাংলা একাডেমী সম্পাদন করে এবং সেখানে নানা ধরণের অসংখ্য গানের উল্লেখ আছে।

১৯৩৮ সালের ২৮ এপ্রিল "রমেশ উদ্বোধন কবি সংঘ" গঠিত হয় এবং তিনি তার সভাপতি নির্বাচিত হন। তখন তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির সংগে জড়িত হন।

তিনি সাধক পুরুষ স্বামী জগদানন্দপুরী মহারাজের শিষ্য ছিলেন। স্বামীজীর আবির্ভাব দিবসে এবং অন্যান্য সময়ে আধ্যাত্মিক কবিগান রচনা করেছেন। তিনি কলকাতা পার্ক সার্কাসে 'যুদ্ধ ও শান্তি' শীর্ষক কবিগান পরিবেশন করে দারুন খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর উদ্যোগে চট্টগ্রামে ১৯৫৬ সালে লোকগীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলনে তাঁকে শ্রেষ্ঠ কবিয়াল হিসাবে সম্মাননা প্রদান করা হয়। ঢাকায় বুলবুল ললিতকলা একাডেমী আয়োজিত উৎসবে লোক-সংগীত ও কবি গান পরিবেশন করেন। ১৯৬৪ সালে চট্টগ্রাম মুসলিম ইনষ্টিটিউট হলে তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা দেয়া হয়। শিল্পী ফকির আলমগীর, শেফালী ঘোষ, কল্যাণী ঘোষ, শাক্য মিত্র বড়ুয়া, শ্যামসুন্দর বৈষ্ণব, শিমুল শীল, আব্দুল মান্নান কাওয়াল সহ অন্যান্য বিখ্যাত শিল্পীগণ রমেশ শীলের গান পরিবেশন করে খ্যাতি অর্জন করেন। ২০০২ সালের ১৯ ফ্রেব্রুয়ারী (৭ ফাল্গুন, ১৪০৮) কবিয়াল রমেশ শীলকে তদানিন্তন মাননীয় প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক মরনোত্তর "একুশে পদক" প্রদান করা হয়।

১৯৬৭ সালের ৬ এপ্রিল (২৩ চৈত্র, ১৩৭৩ বাংলা) কবিয়াল রমেশ শীল দেহত্যাগ করেন। তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তাকে তাঁর গ্রামের বাড়ীতেই সমাধিস্থ করা হয়। তাঁর ছেলে পুলিন বিহারীর সংগে আমার আলোচনা হয় এবং তিনি বললেন তাঁর বাবা রমেশ শীল বাবা ভাণ্ডারীর বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তাই তাঁর মৃত্যুর আগেই বলে গিয়েছিলেন যে, "বাবা ভাণ্ডারীর বেছাল দিবস ২২ চৈত্র, তাই আমি ২৩ চৈত্র দেহত্যাগ করব।" এভাবেই একজন আধ্যাত্মিক সাধকের জীবন অবসান হলো।

নবীদের ইতিহাস

ইমাম উদ্দিন আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে কাসির আদ-দামেস্কী (৭০০-৭৭৪ হিজরী)
[মূল আরবী থেকে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ : রাশাদ আহমদ আজমী]
॥ ইংরেজী থেকে বঙ্গানুবাদ : মুহাম্মদ ওহীদুল আলম ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর : ৮৮ কিস্তি)

এতে হযরত ইজরা (আঃ) আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন। অতঃপর মহিলার চোখের ওপর হাত বুলিয়ে দিলে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান। এরপর মহিলার হাত ধরে তিনি বললেন, "আল্লাহর হুকুমে ওঠে দাঁড়ান।" মহিলা ওঠে দাঁড়ালেন। বার্ধক্য ঝেড়ে ফেলে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠলেন। তারপর বলে ওঠলেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনিই হযরত ইজরা (আঃ)।"

এরপর মহিলা পার্শ্ববর্তী ইসরাইলী মহল্লায় গমন করেন। সেখানে ইসরাইলীরা এক সভায় মিলিত হয়েছিল। সে সভায় হযরত ইজরা (আঃ) এর ১১৮ বছর বয়সী এক সন্তানও ছিল। আর ছিল তাঁর নাতিরাও। মহিলা তাদের বললেন, "ইজরা ফিরে এসেছেন।" কিন্তু কেউ তাঁর কথা বিশ্বাস করলনা। মহিলা বললেন, "আমি অমুক। আপনাদের কাজের বেটি। ইজরা আমার জন্য দোয়া করেছেন। তাই আমি আরোগ্য লাভ করেছি। আমি এখন অন্ধও নই, অথর্বও নই।"

হযরত ইজরা (আঃ) বললেন, "আল্লাহ আমাকে একশ বছর ধরে মৃত অবস্থায় রেখেছেন। অতঃপর আমাকে নূতন জীবন দান করেছেন।" শুনে লোকজন তাঁর চারদিকে ভীড় জমাল। তাঁর ছেলে বলল আমার আব্বাজানের কাঁধে একটা কালো দাগ ছিল। হযরত ইজরা (আঃ) কাঁধের কাপড় সরালেন। দেখা গেল সেখানে একটা বড় কালো তিল রয়েছে। ইসরাইলীরা বলল, "আমাদের মধ্যে ইজরার মত আর কেউ ছিলেন না। তিনি তওরাত মুখস্ত জানতেন। নেবুচান্দনেজার তওরাত ধ্বংস করেছেন। তাওরাতের কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি। তবে মানুষের মুখে যা প্রচলিত আছে তা ছাড়া।" তারা হযরত ইজরা (আঃ) কে তওরাত লিখে দেয়ার অনুরোধ জানাল। উযায়েরের পিতা একখন্ড তওরাত এক যায়গায় লুকিয়ে রেখেছিলেন তা ইজরা ছাড়া আর কেউ জানতেন না। তিনি লোকজনদের সাথে নিয়ে সে নির্দিষ্ট যায়গায় গেলেন। মাটি খুঁড়ে তওরাতের কপি বের করা হল। এর পাতাগুলো জীর্ণ ও লেখাগুলো বিবর্ণ হয়ে পড়েছিল।

হযরত ইজরা (আঃ) একটা গাছের ছায়ায় বসলেন। ইসরাইলীরা তাঁর চারপাশে জড়ো হলো। বর্ণিত আছে আসমান থেকে তখন দু'টো জ্যোতি নেমে এসে তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল। এতে সম্পূর্ণ তওরাত তাঁর স্মরণে পড়ে যায়। তিনি তা পুনরায় লিখে নেন। তাই ইসরাইলীরা বলে থাকে ইজরা আল্লাহর পুত্র।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, **"আমরা মানুষের জন্য তোমাকে নিদর্শন স্বরূপ করেছি।"** (২:২৫৯) এ কথার মর্ম হচ্ছে ইসরাইলীদের জন্য তাঁকে নিদর্শন করা হয়েছে। কারণ চেহারা ছুরতে তিনি তাঁর পুত্র থেকে অনেক সতেজ ছিলেন। তাঁর পুত্রের চেহারায় ছিল বার্ধক্যের ছাপ। তিনি প্রথমবার মারা যাবার সময় তাঁর বয়স ছিল ৪০ বছর। আল্লাহ তাঁকে পুনর্জীবিত করার সময়ও তাঁর বয়স একই ছিল। তাই একশ বছর পরও তিনি পূর্ণ যৌবন সুলভ চেহারা নিয়ে উত্থিত হয়েছিলেন।

হযরত ইজরা (আঃ) ইসরাইলীদের নবী ছিলেন। হযরত সুলায়মান (আঃ) ও হযরত যাকারিয়া (আঃ) এর মধ্যবর্তী সময়ের নবী ছিলেন তিনি। যখন তওরাত সম্পর্কে জানার মত কেউ অবশিষ্ট ছিলনা তখন মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাঝে তওরাতের জ্ঞান ঢেলে দেন।

ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ বলেন, আল্লাহ এক টুকরো জ্যোতি সহ একজন ফিরিশতা পাঠান এবং ফিরিশতা সে জ্যোতি ইজরা (আঃ) এর অন্তরে স্থাপিত করেন। এতে তিনি তওরাত যেভাবে প্রথমবার নাযিল হয়েছিল ঠিক হুবহু অক্ষরে অক্ষরে তা লিপিবদ্ধ করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) সূত্রে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন একবার কুরআন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করেছিলেন,

"এবং ইহুদীরা বলে, উযায়ের আল্লাহর পুত্র।" (৯:৩০)

আর জানতে চেয়েছিলেন কেন ইহুদীরা হযরত উযায়ের (আঃ)কে খোদার পুত্র বলে। তখন তিনি উযায়ের (আঃ) কিভাবে স্মৃতি থেকে তওরাত পুনর্বার লিখেছিলেন সে কাহিনী বর্ণনা করেন। ইসরাইলীরা বলত: "হযরত মূসা (আঃ) পুস্তকাকারে আমাদের কাছে তওরাত এনেছিলেন কিন্তু উযায়ের (আঃ) তা এনেছেন বিনা পুস্তকে।" তাই ইহুদীদের কেউ কেউ বলতো উযায়ের আল্লাহর পুত্র।

তাই কোন কোন মুসলিম পন্ডিত বলেন, হযরত ইজরা (আঃ) এর সময় তওরাতের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে

গিয়েছিল।

হাসান বর্ণনা করেছেন, ইজরা ও নেবুচান্দনেজার সমসাময়িক ছিলেন। একটি হাদিসে নিম্নোক্ত বর্ণনা এসেছেঃ

"হযরত ঈসা (আঃ) এর পরবর্তী নিকটতম নবী হচ্ছি আমি। তাঁর ও আমার মাঝখানে আর কোন নবী আসেননি।" (আল বুখারী)

ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ বলেছেনঃ তিনি হচ্ছেন হযরত সুলাইমান (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ) এর মধ্যবর্তী।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "একজন নবী গাছের ছায়ায় বসেছিলেন। তাঁকে পিপীলিকা কামড় দিয়েছিল, তিনি পিপীলিকাটিকে বের করতে বললেন। অতঃপর তিনি আগুনে পুড়িয়ে দিতে বললেন। আল্লাহ তাঁর কাছে ওহী পাঠালেনঃ পোড়াতে হলেতো একটাকেই পোড়াতে (অর্থাৎ কেন তুমি পিপীলিকার পুরো দলটিকে জ্বালিয়ে দিলে?)"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন এ নবীর নাম ছিলো হযরত উযায়ের (আঃ)।

ছাব্বিশ অধ্যায়
হযরত যাকারিয়া আলায়হিসসালাম
ও
হযরত ইয়াহিয়া আলায়হিসসালাম

মহান রব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে বলেছেনঃ (বঙ্গানুবাদ) "কাফ্ হা ইয়া 'আয়ন সা'দ। এ হচ্ছে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি, যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করেছিল নিভৃতে, সে বলেছিল, আমার অস্থি দুর্বল হয়ে পড়েছে, আমার মাথা হয়েছে শুভ্রোজ্জ্বল, হে আমার প্রতিপালক! তোমাকে আহ্বান করে আমি কখনো ব্যর্থকাম হইনি। আমি আশঙ্কা করি আমার পর আমার স্বগোত্রীয়দের সম্পর্কে, আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, সুতরাং তুমি তোমার নিকট হতে আমাকে দান কর উত্তরাধিকারী, যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করবে, আর উত্তরাধিকারিত্ব করবে ইয়াকুবের বংশের এবং হে আমার প্রতিপালক! তাঁকে করো সন্তোষভাজন'। (১৯:১-৬)

তিনি বললেন, "হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবোদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহিয়া, এ নামে পূর্বে আমি কাউকে নামকরণ করিনি। সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! কী করে আমার পুত্র হবে, যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ও আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত!' তিনি বললেন, 'এ রূপেই হবে।' তোমার প্রতিপালক বললেন, আমার জন্য এটা সহজসাধ্য আমি তো তোমাকে ইতিঃপূর্বে সৃষ্টি করেছি যখন তুমি কিছুই ছিলেনা।' যাকারিয়া বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নিদর্শন দাও।' তিনি বললেন, 'তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ থাকা সত্ত্বেও কারো সাথে তিনদিন বাক্যালাপ করবে না'।" (১৯: ৭-১০)

"অতঃপর সে কক্ষ হতে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে এল ও ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে বলল। আমি বলল, 'হে ইয়াহিয়া! এ কিতাব দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ কর।' আমি তাকে শৈশবেই দান করেছিলাম জ্ঞান এবং আমার নিকট হতে হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা, সে ছিল মুত্তাকী। পিতামাতার অনুগত এবং সে ছিলনা উদ্ধত। তার প্রতি শান্তি ছিল যেদিন সে জন্মলাভ করে ও শান্তি থাকবে যেদিন তার মৃত্যু হবে এবং যেদিন সে জীবিতাবস্থায় পুনরুত্থিত হবে।" (১৯: ১১-১৫)

আবার সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছেঃ (বঙ্গানুবাদ)

"... এবং তিনি তাকে [হযরত মারয়াম (আঃ)] যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে রেখেছিলেন। যখনই যাকারিয়া কক্ষে তার সাথে দেখা করতে যেত, তখনই তার নিকট খাদ্য সামগ্রী দেখতে পেত। সে বলত, 'হে মারয়াম! এসব তুমি কোথা পেলে?' সে বলত, 'এসব আল্লাহর তরফ হতে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে অপরিমিত জীবনোপকরণ দান করেন।' সেখানে যাকারিয়া তার প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তুমি তোমার নিকট হতে সৎ বংশধর দান কর, তুমিই প্রার্থনা শ্রবণকারী।' " (৩:৩৭-৩৮)

"যখন যাকারিয়া কক্ষে সালাতে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন ফিরিশতারা তাকে সম্বোধন করে বলল, আল্লাহ তোমাকে ইয়াহিয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন, সে হবে আল্লাহর বাণীর সমর্থক, নেতা, জিতেন্দ্রিয় এবং পুণ্যবানদের মধ্যে একজন নবী।"

"সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র হবে কিরূপে? আমিতো বুড়ো হয়ে গেছি আর আমার স্ত্রী বন্ধ্যা।' তিনি বললেন, 'এভাবেই।' আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।"

"সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটা নিদর্শন দাও।' তিনি বললেন, 'তোমার নিদর্শন এই যে, তিনদিন তুমি ইঙ্গিত ব্যতীত কথা বলতে পারবেনা। আর তোমার প্রতিপালককে অধিক স্মরণ করবে এবং সন্ধ্যায় ও প্রভাতে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে'।"
(৩:৩৯-৪১) (চলবে)

ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্‌স্টিটিউটে 'ইসলাম ধর্মে মতবিরোধের কারণ ও উত্তরণের সম্ভাব্য উপায়' শীর্ষক সংলাপে বক্তারাঃ ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থে বৈরিতা-মতবিরোধের পথ থেকে সরে এসে এ দ্বন্দ্বমুখর পৃথিবীতে শান্তির আবহ ছড়িয়ে দিতে হবে।

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্টের উদ্যোগে আজ ২ জুন শনিবার চট্টগ্রাম মহানগরীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্‌স্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষে 'ইসলাম ধর্মে মতবিরোধের কারণ ও উত্তরণের সম্ভাব্য উপায়' শীর্ষক সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। মাইজভাণ্ডারী একাডেমীর সভাপতি প্রফেসর ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরীর সভাপতিত্বে সংলাপে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, আলেম ও শিক্ষাবিদগণ বলেছেন, মানবজাতির জন্য ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীন হওয়া সত্ত্বেও চিন্তার ক্ষেত্রে বৈপরীত্য ও অসামঞ্জস্যতার কারণে কিছু মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে নানা বিষয়ে কিছু অমিল ও চিন্তার ক্ষেত্রে মতবৈরিতা থাকতে পারে। কিন্তু ইসলামের মৌলিক চিন্তাধারা ও আক্বিদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মতবৈরিতা ও দ্বন্দ্ব থাকা উচিত নয়। মানবজাতির কল্যাণ ও মুক্তির স্বার্থেই বিরোধপূর্ণ বিষয়ে খোলা মন নিয়ে মতৈক্যে পৌঁছতে হবে এবং ইসলামের মৌলিকতাকে অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থে বৈরিতা-মতবিরোধের পথ থেকে সরে এসে এ দ্বন্দ্বমুখর পৃথিবীতে শান্তির আবহ ছড়িয়ে দিতে হবে। বক্তারা বলেন, নির্লোভ ও নির্মোহ থেকে এবং পরমত সহিষ্ণুতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে দ্বান্দ্বিক অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গড়ে তোলা অসম্ভব। ইসলামের শিক্ষাকে যথাযথভাবে ধারণ করে সত্য প্রতিষ্ঠায় অনমনীয় এবং ব্যক্তি ও গোষ্ঠি স্বার্থে বৈরিতা-মতবিরোধিতার পথ থেকে সরে আসার আহ্বান জানান বক্তারা। আত্মঅহমিকা ও বিচ্ছিন্নতার নীতি পরিহার করে সর্বাবস্থায় ইসলামের ইনসাফভিত্তিক দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার ওপর বক্তারা গুরুত্বারোপ করেন। বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের দুরবস্থার উত্তরণে শান্তি-ঐক্য-সংহতির পথকে সমুন্নত রাখার ওপর বক্তারা জোর দেন। শিক্ষায় অগ্রসরতা, জনকল্যাণে আত্মনিয়োগ, চিন্তার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও কর্মের ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতার নীতি অবলম্বন করাই মতবিরোধের পথ থেকে সরে আসার জন্য জরুরি বলে বক্তারা অভিমত ব্যক্ত করেন। সংলাপ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্টের ম্যানেজিং ট্রাস্টি ও মাইজভাণ্ডার শরিফ গাউসিয়া হক মনজিলের সাজ্জাদানশীন রাহবার-এ-আলম হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মাঃজিঃআঃ)। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন মাইজভাণ্ডারী একাডেমীর সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী। সংলাপ অনুষ্ঠানে বিষয়বস্তুর আলোকে ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক ও শিক্ষাবিদদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আ ন ম মুনির আহমদ চৌধুরী, দর্শন বিভাগের প্রফেসর ড. এম. শফিকুল আলম, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আহসান সাইয়িদ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার আরবি প্রভাষক আল্লামা হাফেজ মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান, চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দিন শ্যামল, সাউদার্ন ইউনিভার্সিটির ইসলামিক স্টাডিজ এন্ড ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন্স এর অধ্যাপক আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ জালালউদ্দিন আল আজহারী, চকরিয়ার সহকারী দায়রা জজ সৈয়দ ফখরুল আবেদীন রায়হান এবং রাংগুনিয়া আলমশাহ্ পাড়া আলিয়া মাদ্‌রাসার প্রাক্তন মোহাদ্দেস আল্লামা নাজমুল হোসেন নঈমী। সংলাপ সঞ্চালনায় ছিলেন ট্রাস্ট সচিব গবেষক এ এন এম এ মোমিন। বিশিষ্ট ব্যক্তি ও শিক্ষাবিদদের মধ্যে সংলাপে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. হেলাল উদ্দীন, চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রিয়াজ হায়দার, জামাল আহমদ সিকদার, গবেষক মুহাম্মদ ওহীদুল আলম, অধ্যাপক মোহাম্মদ গোফরান, আল্লামা মুহাম্মদ শায়েস্তা খান আল আজহারী, সাংবাদিক ইফতেখারুল ইসলাম, জান্নাতুল ফেরদৌস, আলহাজ্ব সামশুল আনওয়ার, অধ্যাপক মীর মোঃ তরিকুল আলম। সংলাপে ১০ দফা খসড়া ঘোষণাপত্র পাঠ করে শোনান প্রফেসর ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী। আলোচক প্রফেসর ড. মুন্সীর আহমদ চৌধুরী বলেন, ইসলামকে যথাযথভাবে না বুঝে কিংবা বুঝেও জ্ঞানপাপী হওয়ার কারণে যারা লাগামহীন কথাবার্তা বলে তাদের কারণেই ইসলাম ধর্মে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহ্ পাক, নবী-রাসুল-ওলী-বুযুর্গদের প্রতি অসম্মান ও কটূক্তির কারণে মতবিরোধ তৈরি হয়। তাই এই প্রবণতা থেকে সবাইকে বেরিয়ে আসতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। আলোচক আল্লামা হাফেজ আনিসুজ্জামান বলেন, যারা মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করছে তারাও মুসলমান দাবীদার। তাদেরকে ওই অনৈক্যের পথ থেকে মূলধারায় ফিরিয়ে আনতে পারলে সুফল মিলবে। পরমতসহিষ্ণুতা লালন ও আত্মঅহমিকা পরিহার করাই বিরোধপূর্ণ বিষয়ে মতৈক্যে পৌঁছার জন্য জরুরি।

মাদ্‌রাসা-এ-গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী আলিম ১ম বর্ষের সবক প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তারা

"অত্র মাদ্‌রাসায় শরীয়ত ও তরিকতের মূল শিক্ষা দেওয়া হয়"

গত ২০ জুন ২০১২ বুধবার সকাল ১০টায় মাদ্‌রাসা-এ-গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী আলিমের ১ম বর্ষের সবক প্রদান অনুষ্ঠান

মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা নূরুল আমিনের সভাপতিত্বে মাদ্‌রাসা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন মাদ্‌রাসা পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সদস্য ও আশেকানে আউলিয়া (ডিগ্রী) ফাজিল মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ মাওলানা খায়রুল বশর হককাশী। তিনি বলেন, অত্র মাদ্‌রাসা শরীয়তের শিক্ষার সাথে সাথে তরিকতের শিক্ষা দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দেশের সুনাগরিক হিসেবে গড়তে অনন্য ভূমিকা পালন করছে। এই মাদ্‌রাসার শিক্ষার্থীরা দুনিয়াবী শিক্ষার পাশাপাশি গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর ফয়ুজাত অর্জনের মাধ্যমে তাদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। অতিথি ছিলেন মাদ্‌রাসা পরিচালনা পরিষদের সদস্য শাহজাদায়ে গাউসুল আযম শাহসূফি সৈয়দ শামসুল আরেফীন মাইজভাণ্ডারী, সৈয়দ জাহেদুল আলম, মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রিয় পর্ষদ সাধারণ সম্পাদক জামাল আহমদ সিকদার। বক্তব্য রাখেন মাওলানা তৌহিদুল্লাহ্, মাওলানা শফিউল আলম, মাওলানা শোয়াইবুল ইসলাম, মাওলানা আবু তৈয়ব, মাওলানা আবদুল্লাহ। উপস্থিত ছিলেন মাওলানা ফোরকান উদ্দীন, ফজলুল বারী, বেলাল উদ্দীন, জালাল উদ্দীন, মাস্টার শাহজাহান, মুহাম্মদ হাসান, ইসরাত তাজমীন প্রমূখ।

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট -এর ব্যবস্থাপনায় মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ -এর শাখা কমিটির সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকদের জন্য দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ৯ জুন শনিবার নগরীর হামজারবাগস্থ গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী খানকাহ্ শরীফ মিলনায়তনে শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট -এর ব্যবস্থাপনায় মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ-এর শাখা কমিটি সমূহের সদস্যদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কার্যক্রমে অধিকতর গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে দিনব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ফটিকছড়ি, রাউজান, হাটহাজারী ও বোয়ালখালী এলাকার মোট ২৫টি কমিটির স্ব-স্ব সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক (সর্বমোট ৫০ জন) কর্মশালায় অংশ নেন। কর্মশালায় পাঠ্যক্রমে 'মাইজভাণ্ডারী দর্শন সম্পর্কে জনমনে প্রচলিত বিভ্রান্তি ও তার নিরসন, নেতৃত্বের যোগ্যতা ও গুণাবলী কুরআনের আলোকে তৌহিদ, রেসালত, বেলায়েত, সূফিবাদ, মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকা ও দর্শনের মূল শিক্ষা, ত্বরিকার বুযুর্গদের জীবনাদর্শ' ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। কর্মশালা সমন্বয়কের দায়িত্বে ছিলেন ট্রাস্টের সচিব এ এন এম এ মোমিন ও আলামা মোহাম্মদ শায়েস্তা খান আল-আজহারী।

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) বৃত্তি পরীক্ষা ২০১২ এর ফলাফল প্রকাশিত

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) বৃত্তি তহবিল কর্তৃক অনুষ্ঠিত শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) বৃত্তি পরীক্ষা ২০১২ এর ফলাফল সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। বিদ্যালয় শাখার ১৫ জন এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী- কলেজ শাখার ৬ জন সর্বমোট ২১ জন ছাত্র ছাত্রী বৃত্তির জন্য মনোনীত হয়েছে তারা হলেন স্কুল শাখা (৬ষ্ঠ শ্রেণী) ১ম- ইশরাত আফরিন রিভা, ফরহাদাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়, ২য়- মেশকাত জাহান রুনা, এ জে চৌধুরী বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, ৩য়- তৃষা দে বারমাসিয়া আবদুল করিম উচ্চ বিদ্যালয়। (৭ম শ্রেণী) ১ম- মোঃ জিয়াউদ্দিন, পশ্চিম ধলই উচ্চ বিদ্যালয়, ২য়- ইন্দ্রজিৎ সূত্রধর, পশ্চিম ধলই উচ্চ বিদ্যালয়, ৩য়- মোহাম্মদ জিয়াউদ্দীন রায়হান, পশ্চিম ধলই উচ্চ বিদ্যালয়। (৮ম শ্রেণী) ১ম- মোঃ ইকরাম হোসেন, ধুরুং খুলশী লয়ন্স স্কুল এন্ড কলেজ, ২য়- মোঃ আলী ওয়াসিম, কাটিরহাট উচ্চ বিদ্যালয়, ৩য়- এ.বি.এম সাফায়েত তাজরিয়ান, ক্যান্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ। (৯ম শ্রেণী) ১ম- মোহাম্মদ মিজান হোসেন ফরহাদাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়, ২য় ইমন উদ্দিন রাহাত, ফরহাদাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়, ৩য়- মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, মাদরাসা-এ-গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী। (১০ম শ্রেণী) ১ম- নাঈমুল ইসলাম, নানুপুর আবু সোবহান উচ্চ বিদ্যালয়, ২য়- মঈন উদ্দিন, কাটিরহাট উচ্চ বিদ্যালয়, ৩য়- মোহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেন ফরহাদ, ফতেপুর মেহেরনেগা উচ্চ বিদ্যালয়। কলেজ শাখা: একাদশ শ্রেণী: ১ম- মোবাশ্বিরা চৌধুরী নাবিলা, কাটিরহাট মহিলা ডিগ্রী কলেজ, ২য়- মোহাম্মদ মোহাইমিনুল হক, চট্টগ্রাম মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ৩য়- নাজমুস সায়ের সেতু, কাটিরহাট মহিলা ডিগ্রী কলেজ। দ্বাদশ শ্রেণী: ১ম- মোহাম্মদ হাসান, চট্টগ্রাম কলেজ, ২য়- নুসরাত জাহান খানম, সাতাবাড়িয়া আলি আহমদ কলেজ, ৩য়- জেসমিন আকতার, নাজির হাট ডিগ্রী কলেজ। বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র ছাত্রীদেরকে মাইজভাণ্ডার শরীফ গাউসিয়া হক মনজিলে বিশ্বঅলি শাহানমাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর ওরশ শরীফের প্রস্তুতি সভায় এক বছরের বৃত্তির টাকা ও সনদপত্র প্রদান করা হবে।

দুবাইতে মাইজভাণ্ডার শীর্ষক আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

গত ১৭ মে মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি দুবাই শাখার উদ্যোগে মাইজভাণ্ডার শীর্ষক আলোচনা ও দোয়া মাহফিল দেরা দুবাইস্থ ল্যান্ডমার্ক হোটেলের হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির সভাপতি শাইফুদ্দিন খালেদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক এম আবুল মনছুরের পরিচালনায় উক্ত সভায় প্রধান

মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সংযুক্ত আরব আমিরাত সফররত গাউসিয়া হক মঞ্জিলের সাজ্জাদানশীন রাহবারে আলম হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মদ্গিঃআঃ)। বিশেষ মেহমান হিসাবে যারা উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন দুবাই কন্সুলেট এর ভারপ্রাপ্ত কনস্যাল জেনারেল ড. মাহমুদুল হক। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস এর কান্ট্রী ম্যানাজার হেমাইত উদ্দীন ও ডাঃ জহুরুল ইসলাম। দুবাই বাংলাদেশ বিজন্যাস কাউন্সিলের সহ সভাপতি আয়ুব আলী বাবুল, ডাকসুর সাবেক ছাত্রনেতা আল মামুন সরকার, আল ইত্তেফাক সিউজ এজেন্সীর স্বত্বাধিকারী ইঞ্জিয়ার আবু নাছের সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন ধর্ম সম্পাদক জানে আলম। নাতে রসুল পাঠ করেন মৌলানা মোঃ মোক্তার। গজলে মাইজভাণ্ডারী পরিবেশন করেন মোঃ ওসমান। দুবাই কমিটির পক্ষ থেকে বাবাজানকে ফুল দিয়ে বরণ করেন কমিটির সভাপতি এবং বাবাজানকে কমিটির পক্ষে একটি ক্রেস্ট উপহার দেন কমিটির দপ্তর সম্পাদক সৈয়দ সাইফুদ্দীন ফারুকী। মিলাদ কিয়াম পরিচালনা করেন মৌলানা দিদারুল আলম। দেশ ও প্রবাসীদের কল্যাণ কামনা করে আখেরী মুনাজাত করেন হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মদ্গিঃআঃ)। পরে তাবরুক বিতরণ করা হয়।

মাসিক আলোকধারার প্রকাশক সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মদ্গিঃআঃ)'র উপস্থিতিতে সভা

১৯ মে সকাল ১১ টায় সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইস্থ হোটেল কোরাল ক্রাউন হল রুমস্থ ইউ এ ই আলোকধারা প্রতিনিধিদের নিয়ে এক জরুরী মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। এতে রাহবারে আলম সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মদ্গিঃআঃ) উপস্থিত ছিলেন। এতে আলোকধারা ইউ এ ই এর প্রত্যেকটি জায়গাতে পৌঁছে দেয়ার জন্য ব্যবস্থা করতে প্রকাশক নির্দেশ দেন। প্রত্যেক প্রতিনিধিদের আলোকধারা প্রচারণা সম্পর্কে প্রতিনিধিগণ মওলা হুজুরকে মত প্রকাশ করেন। প্রতিনিধিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দুবাইর মনছুর, আবিত্রের বক্তেয়ার, শারজাহর প্রকৌশলী নজরুল ও আক্কাস, মুছাফ্ফার মাহবুবুল আলম শাহ, আল আইনের হাবিব উল্লাহ ও ফারুক আজম, সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মাগ্রজিঃআঃ) প্রত্যেক প্রতিনিধিদের কর্মদক্ষতার মধ্যে আল আইনের কার্যক্রমের ১০০% সফলতার প্রশংসা করেন। এবং কিছু দিক নির্দেশনা দেন। ১. যে সমস্ত কমিটিতে প্রতিনিধি প্রয়োজন তা নিয়োগ, ২. প্রচারণার জন্য সৌজন্য কপি দেয়া, ৩. মূল্য নির্ধারণ, ৪. বছরে অন্তত ১/২ টি আঞ্চলিক পাঠক সমাবেশ করে পাঠকদের উৎসাহ দেয়া, ৫. মাইজভাণ্ডার গাউসিয়া হক কমিটির সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করা, তবে এ সময় ইউ এ ইর বিভিন্ন প্রাদেশিক কমিটির দায়িত্ববান ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থেকে তাদের সহযোগীতার আশ্বাস দেন। এ সময় আল আইনের আলোকধারা পাঠক সমাবেশের কর্মবিবরণী মওলা হুজুরের হস্ত মোবারকে দেন হাবিব উল্লাহ, যাতে ছিল ব্যাইজ, দাওয়াত নামা, ও বাবাজানের হস্ত মোবারকে ১টি ডাইরী তুলে দেন, ডাইরীর প্রচ্ছদে শাহানশাহ বাবাজানের রওজা শরীফ শোভা পাচ্ছে। যাহা পাঠক ও আলোকধারা প্রতিনিধিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন, শাহানশাহ হযরত জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী ট্রাস্টের যাকাত তহবিলের সদস্যসচিব জনাব আবদুল বাতেন সাহেব। তাঁকেও ১টি ডাইরী উপহার দেয়া হয়।

আলোকধারা পাঠক সমাবেশ ২০১২

গত ২৩ মার্চ শুক্রবার বাদে জুমা আল আইন হক ভাণ্ডারী দায়রা শরীফে আলোকধারা পাঠক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মোঃ হাবিব উল্লাহ। উপস্থাপনা করেন মোঃ ফারুক আজম, অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গাউছিয়া হক কমিটি আল আইন শাখার সভাপতি মোঃ রফিকুল আলম ফকির, মুছাফ্ফা শাখার মাহবুবুল আলম, দুবাই শাখার সাইফুদ্দীন খালেদ, শফিউল আলম, খানকায়ে গুলজারে আহমদীয়া হাশেমীর জনাব মোঃ আবুল হাশেম শাহ, দুবাই শাখার সাধারণ সম্পাদক আবুল মনছুর, প্রতিনিধিদের মধ্যে বখতিয়ারসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। পাঠকদের পক্ষে মন্তব্য করেন, জানে আলম জাহাঙ্গীর। বক্তব্য রাখেন এমদাদ ভূইয়া, সেলিমউদ্দীন, রফিকুল আলম ফকির, সাইফুদ্দীন চৌং খালেদ, শফিউল আলম, আবুল হাশেম শাহ ফকির ও মাহবুবুল আলম শাহ সহ দায়িত্ববান ব্যক্তিবর্গ। সমাপনী বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের সভাপতি হাবিব উল্লাহ। আখেরী মুনাজাত করেন জনাব মোঃ রফিকুল আলম ফকির।

হক কমিটি রেয়াজউদ্দীন বাজার শাখার উদ্যোগে হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) চান্দ্র বার্ষিকী ফাতেহা শরীফ অনুষ্ঠিত

মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ রেয়াজউদ্দীন বাজার শাখার উদ্যোগে হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) চান্দ্র বার্ষিকী ফাতেহা ও হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ মঈন উদ্দীন হাসান চিস্তির (রাঃ) বার্ষিক ওরশ উপলক্ষে রেয়াজউদ্দীন বাজার আর এস রোডে মিলাদ মাহফিল, আলোচনা সভা ও গরীব মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়। আলকরণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর দিদারুল আলম লাভুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রিয়াজ হায়দার

চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন রেয়াজউদ্দীন বাজার বণিক কল্যাণ সমিতির উপদেষ্টা চেয়ারম্যান আব্দুল মোতালেব চৌধুরী, সমিতির সাধারণ সম্পাদক এম এ এয়াকুব, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ নুরুল আকবর, মানবাধিকার উন্নয়ন সমন্বয় পরিষদ চট্টগ্রাম বিভাগীয় সাধারণ সম্পাদক নুর মোহাম্মদ পুতু, সমাজসেবক মাহমুদ হোসাইন ও নুরুল আবছার সওদাগর। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নাজিম চৌধুরী, হাসান মুরাদ, জসিম উদ্দীন, আবু তাহের, মাহমুদুল হক, আব্দুল মালেক, জয়নাল আবেদীন, নাজিম উদ্দীন ও সেলিম উদ্দীন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রিয়াজ হায়দার চৌধুরী বলেন, ওলীয়ে কেরামদের আর্দশ অনুসরণ করলেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সুখ ও শান্তি আসবে। তিনি ন্যায়নীতি ও সততার মাধ্যমে হালাল রুজি অর্জন করার জন্য ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানান।

গাউসিয়া হক কমিটি খিতাপচর স্মরণ সভার মাসিক সভা ও হযরত মঈনুদ্দীন চিশতী (রাঃ)'র ফাতেহা শরীফ অনুষ্ঠিত

গাউসিয়া হক কমিটি খিতাপচর স্মরণ সভার উদ্যোগে গত ১ জুন ২০১২ শুক্রবার কমিটির বেঙ্গুরাছ্ কার্যালয়ে জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম (অডিটর) সাহেবের সভাপতিত্বে মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কুরআন তিলওয়াত করেন মৌলানা ছালামত উদ্দিন এবং শজরা পাঠ করেন সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম। সভায় গরীবে নেওয়াজ হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রা.) এর ফাতেহা এবং বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক (কঃ) এর মাতাজান সৈয়দা শাজেদা খাতুন এর ফাতেহা শরীফ উপলক্ষে আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম, মুজিবুর রহমান (মুজিব) অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আবুল কালাম, মুছা খান, মোঃ ইকবাল, নাছির উদ্দীন, জালাল উদ্দিন খান, দিদারুল আলম, হামিদ আলী, মনছুর, বাশি, মমতাজ বেঙ্গুরা ৩নং ইউনিট এর নুরুল আলম, মিজান চৌধুরী, খিতাপচর ৫নং ও ৬নং ইউনিট শাখার যথাক্রমে জসিম উদ্দীন, ইকবাল, সাজ্জাদ, আরমান, বেলাল ও রফিক। পরে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেমা মাহফিলের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন।

ধলই বিশ্ব ভাণ্ডার লাইব্রেরীর উদ্যোগে জিয়া মাওলার চান্দ্র বার্ষিকী ফাতেহা শরীফ উদযপন

মহান ১২ রজব ৩ জুন ২০১২ রবিবার বিশ্ব অলি শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর পবিত্র চান্দ্র বার্ষিকী ফাতেহা শরীফ বিশ্ব ভাণ্ডার লাইব্রেরীর উদ্যোগে বিশ্ব অলি শাহানশাহ জিয়া "মওলা" এর হুজরা শরীফ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে আলোচনা সভা, মিলাদ-কিয়াম ও জিকির মাহফিল সহ গরীব দুঃখী মানুষের মাঝে চারা বিতরণ অনুষ্ঠান এর আয়োজন করা হয়। কে. এম. আবদুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দুই পর্বের অনুষ্ঠান মালায় ১ম পর্বে আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিলে প্রধান মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাইজভাণ্ডার শরীফ গাউসিয়া রহমানিয়া গণি মনজিলের সাজ্জাদানশীন প্রফেসর শাহজাদা সফিউল গণি মাইজভাণ্ডারী (মদ্দজিঃআঃ)। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী রওজা শরীফের খাদেম হাফজ আবুল কালাম সাহেব, আলোচক বৃন্দ তাদের আলোচনায় তাৎপর্যপূর্ণ মহান দিবস শাহানশাহ বাবাজানের চান্দ্র বার্ষিকী ফাতেহা শরীফ উদযাপন সহ মানব কল্যাণ মূলক বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে "মওলা" এর শান-মান, আদর্শ এবং উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ও প্রচার প্রসারে আরো জোরালো ভূমিকা রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন। ২য় পর্বে গরীব দুঃখী মানুষের মাঝে চারা বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে চারা বিতরণ করেন হাটহাজারী উপজেলা পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব অধ্যক্ষ মোহাম্মদ ইসমাইল, আরো উপস্থিত ছিলেন এনায়েতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক আবুল ফারাহ চৌধুরী সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। বিশ্বের শান্তি-সমৃদ্ধি ও উন্নতি কামনা করে মোনাজাত পরিচালনা করেন হাফেজ আবুল কালাম। মোনাজাত শেষে তাবারুক বিতরণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি সূর্যগিরি আশ্রম শাখার সভা অনুষ্ঠিত

মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি সূর্যগিরি আশ্রম শাখার উদ্যোগে গত ১০ জুন চট্টগ্রামের অস্থায়ী কার্যালয়ে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন আশ্রমের অধ্যক্ষ ও মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি সূর্যগিরি আশ্রম শাখার সম্মানিত সভাপতি ডা. শ্রী বরুন কুমার আচার্য্য (বলাই)। তিনি মাসিক আলোকধারার নতুন বাৎসরিক গ্রাহক সংগ্রহ করার জন্য এবং আলোকধারা পড়ার জন্য অনুরোধ জানান এবং সংগঠনের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমকে আরো বেগবান করার লক্ষে সংগঠনের সকল সদস্য সদস্যাদের আন্তরিক হওয়ার অনুরোধ জানান। এছাড়া আশ্রমের উদ্যোগে দুঃস্থ সেবা কার্যক্রমের আওতায় বিনা মূল্যে চিকিৎসা সেবা, বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক ধীমান দাশ। বক্তব্য রাখেন সহ-সভাপতি টিটু চৌধুরী, মৃদুল দে, সুমন দাশ। উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ছোটন ধর, অনুপম তালুকদার, কৃষ্ণ বৈদ্য, উত্তম দত্ত, বিশু চৌধুরী, প্রিন্স দাশ, শশী মহাজন।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটির মিলাদ মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন রাহ্‌বারে আলম হযরত আলহাজ্ব সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মঃজিঃআঃ)।

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের সম্মেলন কক্ষে ট্রাস্ট কর্তৃক আয়োজিত সংলাপ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ট্রাস্ট সচিব এ এন এম এ মোমিন ও ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের সম্মেলন কক্ষে সংলাপ অনুষ্ঠানে উপস্থিত আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ।

মাদ্‌রাসা-এ-গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর আলিম ১ম বর্ষের সবক প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাওলানা খায়রুল বশর হককানী।

ওমানে মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটির মিলাদ মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন রাহ্‌বারে আলম হযরত আলহাজ্ব সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মঃজিঃআঃ)।

THE MONTHLY ALOKDHARA REGD. NO CHA - 272 PRICE - 15.00

রোযার গুরুত্ব ও ফাযায়েল - হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমনিভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর, যেন তোমরা তাক্বওয়া অর্জন করতে পার। *(আল - কুরআন)*
রসুল (সা) ইরশাদ করেন, রমযান এমন একটি মাস; যার প্রথমাংশে আল্লাহ পাকের রহমত, মধ্যমাংশে মাগফিরাত ও শেষাংশে দোযখ থেকে পরিত্রাণের ফয়সালা অবতীর্ণ হয়। *(আল - হাদিস)*

নিয়ত - নাওয়াইতুআন আছুম্মা গাদাম মিন শাহরে রমজানুল মোবারক ফারদাল্লাকা ইয়া আল্লাহু ফাতাকাব্বাল মিন্নি ইন্নাকা আনতাস্ সামিউল আলিম।
দোয়া - আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু ওয়াবেরিজক্বিকা আফ্তারতু আল্লাহুম্মাগফিরলী ক্বাদ্দমতু ওয়ামা আখ্যারতু।

রমযান বার্তা ১৪৩৩ হিজরী / সাহরী ও ইফতারের সময়সূচী

রমযান মাস	ইংরেজী মাস	বার	সাহরীর সময়	ইফতার
রহমত				
০১	২১ জুলাই	শনিবার	৩.৫০	৬.৪২
০২	২২ জুলাই	রবিবার	৩.৫১	৬.৪২
০৩	২৩ জুলাই	সোমবার	৩.৫১	৬.৪১
০৪	২৪ জুলাই	মঙ্গলবার	৩.৫২	৬.৪১
০৫	২৫ জুলাই	বুধবার	৩.৫২	৬.৪০
০৬	২৬ জুলাই	বৃহস্পতিবার	৩.৫২	৬.৪০
০৭	২৭ জুলাই	শুক্রবার	৩.৫৩	৬.৪০
০৮	২৮ জুলাই	শনিবার	৩.৫৪	৬.৩৯
০৯	২৯ জুলাই	রবিবার	৩.৫৪	৬.৩৯
১০	৩০ জুলাই	সোমবার	৩.৫৪	৬.৩৮
মাগফিরাত				
১১	৩১ জুলাই	মঙ্গলবার	৩.৫৫	৬.৩৮
১২	০১ আগষ্ট	বুধবার	৩.৫৫	৬.৩৭
১৩	০২ আগষ্ট	বৃহস্পতিবার	৩.৫৬	৬.৩৭
১৪	০৩ আগষ্ট	শুক্রবার	৩.৫৬	৬.৩৬
১৫	০৪ আগষ্ট	শনিবার	৩.৫৭	৬.৩৫
১৬	০৫ আগষ্ট	রবিবার	৩.৫৭	৬.৩৫
১৭	০৬ আগষ্ট	সোমবার	৩.৫৮	৬.৩৪
১৮	০৭ আগষ্ট	মঙ্গলবার	৩.৫৯	৬.৩৪
১৯	০৮ আগষ্ট	বুধবার	৩.৫৯	৬.৩৩
২০	০৯ আগষ্ট	বৃহস্পতিবার	৪.০০	৬.৩৩
নাজাত				
২১	১০ আগষ্ট	শুক্রবার	৪.০১	৬.৩২
২২	১১ আগষ্ট	শনিবার	৪.০২	৬.৩২
২৩	১২ আগষ্ট	রবিবার	৪.০২	৬.৩১
২৪	১৩ আগষ্ট	সোমবার	৪.০৩	৬.৩০
২৫	১৪ আগষ্ট	মঙ্গলবার	৪.০৪	৬.২৯
২৬	১৫ আগষ্ট	বুধবার	৪.০৫	৬.২৯
২৭	১৬ আগষ্ট	বৃহস্পতিবার	৪.০৫	৬.২৮
২৮	১৭ আগষ্ট	শুক্রবার	৪.০৫	৬.২৮
২৯	১৮ আগষ্ট	শনিবার	৪.০৬	৬.২৭
৩০	১৯ আগষ্ট	রবিবার	৪.০৭	৬.২৬